শারদ সংখ্যা

১৪১৯

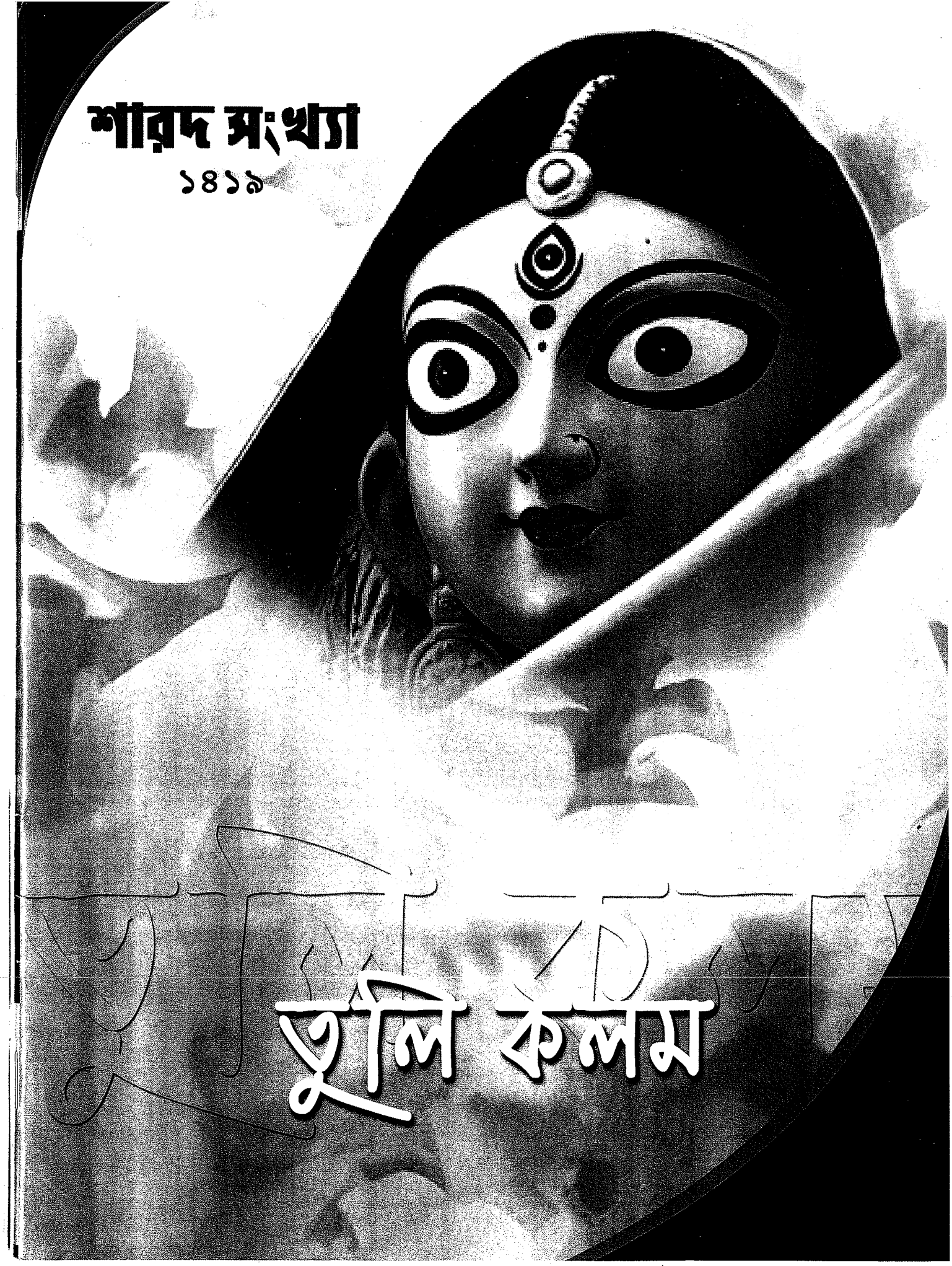

তুলি কলম

$0 Cost Home Loans

FORTUNE FINANCIAL

Simply Exceptional

- **Lowest Mortgage Rates**
- **Exceptional Service**
- **Purchase & Refinance**

303.706.0920

www.efortunefinancial.com

তুলি কলম

শারদ সংখ্যা ১৪১৯ (২০১২)

মিলনী কমিটির পক্ষ
থেকে আপনাদের
সকলকে জানাই
শুভ শারদীয়া-র
প্রীতি
ও
শুভেচ্ছা

সম্পাদক
অনির্বাণ চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদক
কৌশিক চক্রবর্তী

সূচীপত্র

Content		Page No.
সম্পাদকীয়		১
From the President's Desk		২
নানারঙের দিনগুলি		৩
রবিবাবুর গান ও তার গায়ন	অনিন্দ্য বসু	৫
যতবার আলো জ্বালাতে চাই	শুভা আঢ্য	৮
মা কামাখ্যার দর্পণে কমলা - গল্প হলেও সত্যি !	আলপনা চৌধুরী সিন্‌হা	১৫
Ghost Lover's Tales	Mita Mukherjee	১৬
যাত্রা	বাসুদেব আচার্য	১৯
আমাদের NRM (Nonresident Mother) ঃ অথবা কিছু স্মৃতিকথা	অনুভা গোস্বামী	২৭
আজব গ্রাম লাচার	সোমজিৎ মিত্র ও দেবশ্রী মিত্র	৩০
সম্পর্ক	অমিত নাগ	৩২
Mother – Maa	Mita Mukherjee	৩৮
পুরাতনী	সোমনাথ রায়	৩৯
জীবন	সুশীল সিংহ	৩৯
পালকের মত ঠিক	অনির্বাণ চক্রবর্তী	৩৯
শুক ও সারী	নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত	৪০
জলচর	সুবীর বোস	৪০
লিখলে চিঠি	সায়ন্তন গোস্বামী	৪০
অনামিকা তুমি শোনো	সুবীর বোস	৪০
অনাবিষ্কৃত	শ্রদ্ধা পত্রনবীশ	৪১
শারদ বার্তা	কৌশিক চক্রবর্তী	৪১
না স্নেহকরস্পর্শ	সুব্রত সরকার	৪২
দূর থেকে দেখা	সংগীতা দাশগুপ্ত রায়	৪২
ইচ্ছা	সংগীতা দাশগুপ্ত রায়	৪২
শব্দছকের সমাধান		৪২
গরুর গাড়ীর হেডলাইট	অমিত নাগ	৪৩
গা বাঁচিয়ে চলি	শুভময় গাঙ্গুলী	৪৩
Is Love Unconditional?	Roshmi Bhowmik	৪৪
My traveler's Mind	Mousumi Bhattacharya	৪৪
Twilight - years	Mita Mukherjee	৪৪
My Last Trip with my Grandma and Grandpa in Colorado	Agni Obin Basu	৪৫
Drawing	Aahana Nandi	৪৬
	Rupkhatha Biswas	৪৬
Why you should not eat Candy	Portia Bhattacharjee, Kritika Krori and Ishana Banerjee	৪৬
Ma Durga	Medha Pan	৪৭
Nino	Srijita Ghoshal (Tutul)	৪৭
Bio-Poem	Sanjana Nandy	৪৭
My Thoughts	Srijita Ghoshal	৪৭
Through my eyes	Pourna Sengupta	৪৭
How the Tigher Got Its Stripes	Aritra Nag	৪৮
রান্নাঘর থেকে সরাসরি		
মাছের মাথার ঘন্ট	মূল রেসিপি - শ্রীমতি নিরুলতা পাত্র সঙ্কলন ও অনুলিখন - সুলগ্না পাত্র	৪৯
ফ্রায়েড মুড়িঘন্ট	মূল রেসিপি - শ্রীমতি দীপ্তি চক্রবর্তী সঙ্কলন ও অনুলিখন - সুলগ্না পাত্র	৪৯
পুজোর শব্দছক		৫০

সম্পাদকীয়

অনেক কিছু লেখা বাকি রয়ে যায়। যেমন ধরুন জোনাথন ব্লান্কের কথাই। একটি ৪ বছরের ফুটফুটে মেয়ে আর ২ বছরের দারুণ সুন্দর ছেলের বাবা। এক দারুণ হাওয়া মাখানো সন্ধ্যায় বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে গেল। বান্ধবী বাড়ী ফিরল কিন্তু যার জন্য ফিরতে পারল সেই ব্লান্ক আর ফিরল না। আচ্ছা ঠিক কি ভাবছিল ব্লান্ক তার বান্ধবীকে বাঁচানোর সময় .... উঁহু তা আর লেখা হয় না। কিম্বা ধরুন ৬ বছরের ভেরোনিকা মায়ের কাছে বায়না জুড়ল মুভি দেখতে যাবে। গেল কিন্তু আর এলো না। একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে তার মায়ের জীবনের রোজনামচা কিন্তু কেউ লেখে নি। কেউ লেখে না। কেউ লিখতেও পারবে না। Alexandar Boik, Jesse Childress, Gordon Cowden, Jessica Ghawi, John Thomas Lariman, Matt McQuinn, Micyla Medek, Alex Sullivan, Alex Teves, Rebecca Wingo দের কথা না লেখাই রয়ে যাবে। যাক ক্ষতি নেই। শুধু এই সময়ের-ই ফসল এক উন্মাদের হাতে কলোরাডোর এতগুলো তাজা প্রাণের চলে যাওয়া আমাদের বেঁচে থাকার প্রেক্ষিত কে আরও তীক্ষ্ণ করে তোলে। এই সময়ে বেঁচে থাকাটাই একটা মহান কাজ। ইচ্ছে বা অনিচ্ছে নয়, বেঁচে থাকার তাগিদেই শারদ উৎসবকে আহ্বান করতে হয়। আসুন না, এই বেঁচে থাকার উৎসবেই অবগাহন করি। মিলনীর তরফ থেকে প্রার্থনা করি শারদ উৎসব যেন সবার জীবনে আনন্দ বৃষ্টি হয়ে নেমে আসে।

এত কিছু লিখলেও প্রচুর না লেখা থেকে গেল। থাক না। সব লিখে ফেললেও তো নষ্ট জীবন।

From the President's Desk

On this special occasion of the year, on behalf of Milonee of Colorado 2012, I would like to welcome all of you to join us in celebrating the biggest festival of Bengal , Durgostav. Here at Milonee, we strive to bring back those long forgotten times experienced back home, those which we can only try our best to recreate. We as a community hold a vision that we come together every year to celebrate this auspicious occasion being so far away from home and our loved ones. We all gather together under the banner of Milonee with a spirit of oneness, offering our earnest prayers to Debi Durga to invoke Her goodwill upon us. Away from our homeland , we celebrate together to provide fond memories to our younger generation growing up in America so that they look back and reminisce as we today from our childhood days. This year we continued on the path of making Puja enjoyable to both you and your family.

It would be my pleasure to take this opportunity to congratulate the founding members of Milonee, who had the vision to build this association and give it a good foundation to grow deep within the community in Colorado. Milonee this year is fortunate to have a present committee of very dedicated and hardworking individuals who share the same values of giving back to the community as their predecessors. The committee members and volunteers have worked relentlessly to make this Durga Puja Utsav a successful event for our community.

This year marks a special milestone for our Milonee community. We are pleased to announce that this year's Durga Puja will feature our Notun Protima from Kumartuli, Kolkata .We are grateful to the support we have received from all our sponsors and those who have generously donated to make this dream of ours successful. For me personally this was an opportunity to relive the childhood memories of visiting Kumartuli and transporting the Notun Protima to our Puja Mandop.

In addition to the religious elements during Puja, the festival acts as the cultural platform for the Bengalis in Colorado. I am delighted to tell you that keeping with the tradition of Milonee, we have arranged an array of exciting programs with artist from Kolkata, Ujjaini Mukherjee who will be performing with a live band. In addition we have numerous performances by our immensely talented local artists.

We express our deepest gratitude to all the sponsors and the donors for their spontaneous help alongside your participation which is vital for the success of our growing community.

I look forward to the year ahead in Milonee's chapter with the new committee taking over the responsibilities and providing us a more improved and expanded platform for our community to come together. I would like to remind you that organization like Milonee thrives on the spirit of voluntarism. I hope every year more community members will extent support to come forward and give back to the society through their active participation in the committee.

Sincerely,

Sumit Nandy

(President Milonee of Colorado, 2012)

নানা রঙের দিনগুলি

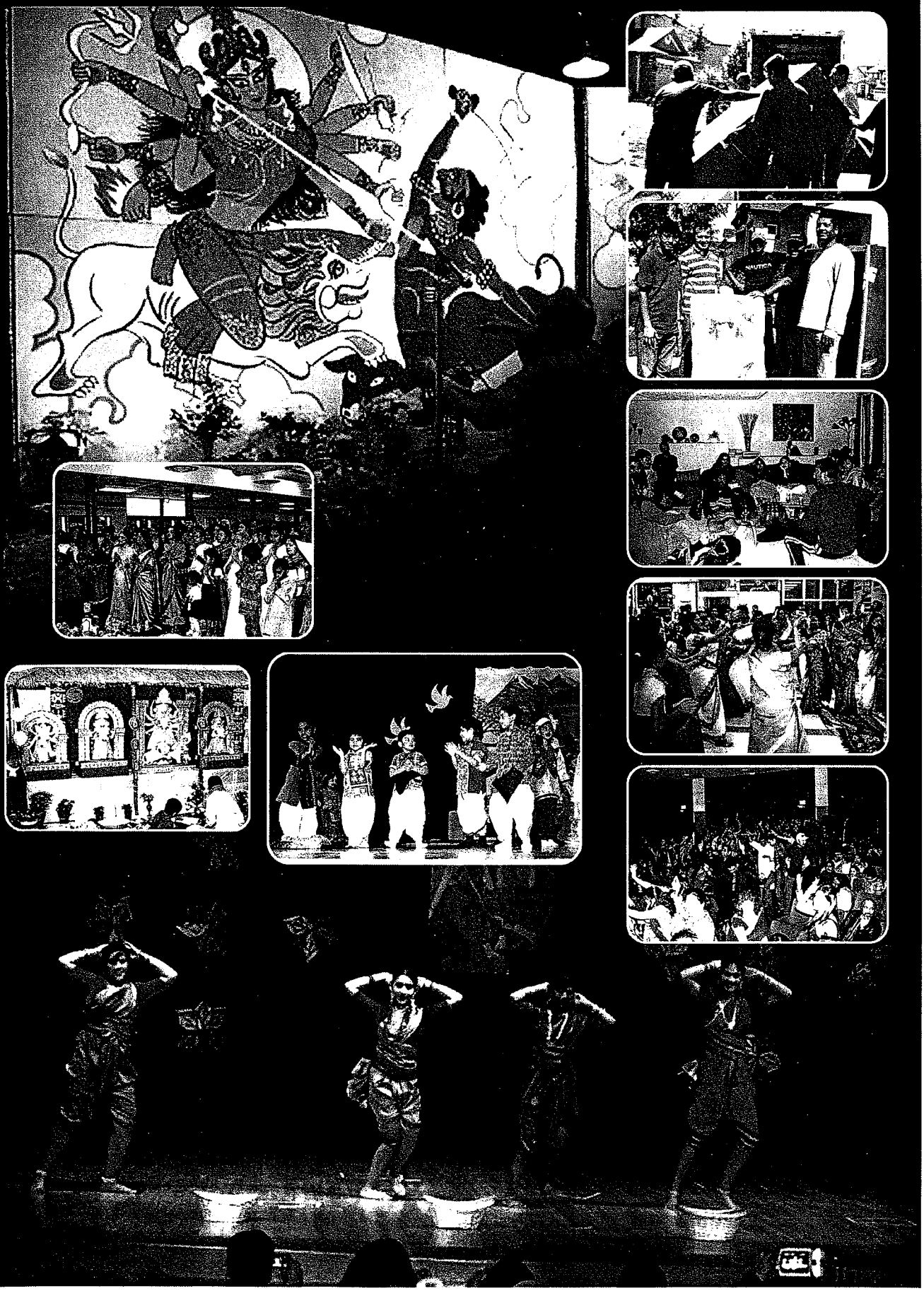

Why life insurance? Because people depend on you.

How much and what type? That depends on you too. Call me today for a free, no-obligation Life Insurance Needs Analysis.

AMERICAN FAMILY INSURANCE®

American Family Life Insurance Company
Home Office – Madison, WI 53783
www.amfam.com

©2006 002023– 1/06

Ram V Nathan Agency, Inc.
9085 E Mineral Circle, Suite 370
Englewood, CO 80112
rvaithia@amfam.com
(303) 799-0777 Bus
(303) 799-0779 Fax

রবিবাবুর গান ও তার গায়ন

অনিন্দ্য বসু

গান ভালবেসে গান। আধুনিক বাংলা গানের এই এখন মূল মন্ত্র। হক্ কথা। ন্যায্য কথা। কিন্তু শুধু ভালবেসে গাইলেই হল? গানের ব্যাকরণ, শৈলী, স্বরলিপি ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না? বিশেষতঃ গানটি যদি রবীন্দ্র সঙ্গীত, অর্থাৎ যা রবিঠাকুরের সময়ে 'রবিবাবুর গান' বলে পরিচিত ছিল, তা হলে? তার বেলায় কী খালি ভালবাসলেই চলবে? এ নিয়ে বিস্তর তর্ক, চিঠি চালা-চালি, আলোচনা ইত্যাদি সেই রবীন্দ্রনাথের আমল থেকে হয়ে আসছে। সেই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যোগ দিয়েছেন বহুবার। রবীন্দ্রনাথ নিজে সঙ্গীত সম্বন্ধে বেশ কিছু লেখা লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন এবং বলা বাহুল্য নিজের গানের ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন। ছাপার অক্ষরে সেসব ধরাও আছে। অতএব, যদি শুরুর থেকে শুরু করি, তাহলে দেখা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের কী বক্তব্য ছিল তাঁর নিজের গানের গায়ন সম্বন্ধে? রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টতই প্রথম দিকে বলেছেন যে তাঁর গান অবিকৃত ভাবে গাইতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমারকে তাঁর গানে variation করার অনুমতি না দিয়ে এ প্রসঙ্গে বলেছেন 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকার, তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। তাই কোনো দরবারী কানাড়ার খেয়াল সাদামাটা ভাবে গেয়ে গেলে সেটা নেড়া-নেড়া না শুনিয়েই পারে না। কারণ দরবারী কানাড়া তানালাপের সঙ্গেই গেয়, সাদামাটা ভাবে নয়। আমার গানেতো আমি সেরকম ফাঁক রাখিনি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব' ('সঙ্গীতচিন্তা')। অর্থাৎ এখানে হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে নিজের গানের তফাৎ নির্দেশ হয়েছেন। অন্যদিকে তিনি তাঁর 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধে লিখছেন 'এইখানে য়ুরোপের সঙ্গীত - পলিটিক্সের সঙ্গে আমাদের সঙ্গীত-পলিটিক্সের তফাত। সেখানে ওস্তাদকে অনেক বেশি বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকিতে হয়। গানের কর্তা নিজের হাতে সীমানা পাকা করিয়া দেন, ওস্তাদ সেটা সম্পূর্ণ বজায় রাখেন। তাঁকে যে নিতান্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হইবে তাও নয়, আবার খুব যে দাপাদাপি করিবেন সে রাস্তাও বন্ধ। য়ুরোপে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ ব্যক্তি, সে আপনার মধ্যে প্রধানত আত্মমর্যাদাই প্রকাশ করে। ভারতে প্রত্যেক গান একটি বিশেষ-জাতীয়, সে আপনার মধ্যে প্রধানত জাতিমর্যাদাই প্রকাশ করে।'

এই দুটি লেখা পাশাপাশি রেখে পড়লে মনে হয় গানের রূপায়ণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ হয়ত য়ুরোপীয় রীতিকেই আদর্শ মানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গানের অবিকৃত রূপের খোঁজ আমরা পাব কি করে? সহজ উত্তরটা হল স্বরলিপি দেখে। সেইটেই য়ুরোপীয় পদ্ধতি। কিন্তু রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে সেখানে গণ্ডগোল আছে। তার অনেকগুলি কারণ। প্রথমত একাধিক রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটির বেশি স্বরলিপি চালু আছে। ধরুণ 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' গানটি। এই গানটি একটি জনপ্রিয় গান। কিন্তু এর তিনটি স্বরলিপি বাজারে পাওয়া যায়। একটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের করা, একটি সরলা দেবীর (রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী) করা এবং তৃতীয়টি দিনু ঠাকুরের করা। তিনটি স্বরলিপিতে সামান্য হলেও বিভেদ আছে। অতএব অবিকৃত একক রূপের নির্ধারণ করা এক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সেইরকম আবার 'তবু মনে রেখ' গানটির ও চারটি স্বরলিপির খোঁজ মেলে। সেগুলি প্রায় এক হলেও হুবহু এক নয়। এবার ধরুন 'এ পরবাসে রবে কে' গানটি। এটির অনেকগুলি রেকর্ড বাজারে পাওয়া যায়। তার মধ্যে যদি কণিকা বন্দোপাধ্যায় রেকর্ডটি শোনেন এবং অমিয়া ঠাকুরের গাওয়া গানটি (এটি সত্যজিৎ রায় তাঁর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির জন্য রেকর্ড করান) শোনেন, তা হলে দেখবেন, 'কে রবে সংশয়ে' এই অংশে, কণিকা '-শয়ে'-তে কোমল নিখাদ (ম-ণ) ব্যবহার করেছেন, স্বরলিপিতেও তাই আছে, কিন্তু অমিয়া ঠাকুর তা করেন নি। দুজনেই তো সমান মান্য। একজন শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনে শৈলজারঞ্জনের শিষ্যা, আর অন্যজন ঠাকুরবাড়ির বউ এবং রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর গান ভীষণ ভালোবাসতেন ও তাঁকে নিজে শিখিয়েছেন। এবারে দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের গান তাঁর অন্যান্য প্রিয় গায়ক-গায়িকারা কেমন করে গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের লেখা গান, 'স্বপন যদি ভাঙ্গিলে'

(রামকেলী রাগে নিবন্ধ) এই গানটি বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত গায়ক রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী গেয়েছেন, শুদ্ধ আকারে বিস্তার করে এবং তান করে, তবে রামকেলি রাগের রূপ অবিকৃত রেখে। সে গান রেকর্ডের অনুমতি তো রবি ঠাকুরই দিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে সেই গান শুনেই ওস্তাদ ভি ভি ঝলওয়ার গানটির স্বরলিপি করেছেন। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে, গান গাওয়া আগে, পরে স্বরলিপি এসেছে। কিন্তু, সেই বিস্তারের তো স্বরলিপি নেই। তেমনি আবার 'বুঝি ঐ সুদূরে' গানটির কোন স্বরলিপি প্রথমে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একবার বসন্ত উৎসবের জন্য গানটি লেখেন (সাহানা দেবীর কাছে একটি হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় গান শুনে) এবং সাহানা দেবীকে শেখান। এই গানটি পরে সাহানা দেবী রবীন্দ্রভারতীর জন্য রেকর্ড করে দেন, যা থেকে স্বরলিপি করা হয়। অর্থাৎ এখানেও আগে গাওয়া গানটি ও পরে তার স্বরলিপি। গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়ের গাওয়া, নটমল্লার রাগে 'মোরে বারে বারে ফিরালে' গানটিতেও, স্বাধীন সুরবিহারের নজীর মিলবে। এদের সবাইকে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত পছন্দ করতেন এবং উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী বলে মনে করতেন। এইসব ক্ষেত্রে কিন্তু গানের রূপটি পুরোপুরি গায়ক বা গায়িকা নির্ভর হয়ে রইল। এবং বাস্তবিক রবীন্দ্রনাথ নিজেই দিলীপকুমারের সঙ্গেই আলোচনায় অন্যত্র পরের দিকে বলছেন, 'আমিতো একথা বলি নি যে, কোনো বাংলা গানেই তান দেওয়া চলে না। অনেক বাংলা গান আছে যা হিন্দুস্থানী কায়দাতেই তৈরী, তানের অলংকারের জন্য তার দাবি আছে। আমি এ রকম শ্রেণীর অনেক গান রচনা করেছি। সেগুলিকে আমি নিজের মনে কত সময়ে তান দিয়ে গাই।' ('সঙ্গীতচিন্তা') তাহলে কী উনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচরণ করলেন? তা নয়। কারণ পরের দিকে দিলীপ কুমারের সঙ্গে আলোচনায় উনি সে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শেষ কথা সুরবিহার সম্বন্ধে। ইংরেজী improvisation কথাটির তুমি বাংলা করেছ সুরবিহার-এও আমি ভালবাসি। এতে যে গুণী ছাড়া পায় তাও মানি। আমার অনেক গান আছে যাতে গুণী এরকম ছাড়া পেতে পারেন অনেকখানি। আমার আপত্তি এখানে মূলনীতি নিয়ে নয়। তার প্রয়োগ নিয়ে। কতখানি ছাড়া দেব? আর, কাকে? বড়ো প্রতিভা যে বেশি স্বাধীনতা দাবি করতে পারে একথা কে অস্বীকার করবে? কিন্তু এক্ষেত্রে ছোটো বড়োর তফাত আছেই .....' ('সঙ্গীতচিন্তা') অর্থাৎ উনি নিজের মতামত আর একটু বিশদে জানালেন, এবং দেখা গেল, একজন composer হিসেবে উনি ওনার গানের ব্যাপারে রক্ষণশীল, কিন্তু গোঁড়া নন। কারণ উনি নিজেই একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলেই। ওনার গানের স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে ইনি প্রচন্ড আগ্রহী, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করছেন, হয়ত কিছুটা বাধ্য হয়ে যে, যেহেতু ওনার বেশির ভাগ গানই মূলে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ভিভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, এবং সেই সঙ্গীতের ব্যাকরণ অনুযায়ী রাগবিস্তার শাস্ত্রসম্মত সুতরাং সেই গান গাইবার সময় কোন শিল্পী কিছুটা সুরবিহার করতেই পারেন। তবে এই স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথ সবাইকে দিতে রাজি ছিলেন না। সঙ্গত কারণেই। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধুই রাগসঙ্গীত নয়। সেখানে কথা ও সুরের সমান সমান অধিকার। অতএব, সুরের বিস্তার করতে গিয়ে যদি কথা মার খায় তাহলে সেটা মেনে নেওয়া মুশকিল। গানে কথা ও সুরের সমানাধিকারের কথা উনি বার বার বলেছেন। বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে, লক্ষ্ণৌ ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ও বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে বলছেন, 'বাংলায় নতুন যুগের নতুন গান সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুর মিলিয়ে। সেই সুরকে খর্ব করা চলবে না তার গৌরব কথার গৌরবের চেয়ে হীন হবে না। সংসারে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকারে দাম্পত্যের যে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ ঘটে, বাংলা সঙ্গীতে তাই হওয়া চাই। এই মিলনসাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সংগীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে।' ('সুর ও সঙ্গতি') অর্থাৎ কথা ও সুরের সমানাধিকার। শেষ পর্যন্ত উনি নিজের গানের গায়ন সম্বন্ধে বলেছেন (প্রফুল্লকুমার মহালনবীশকে লেখা একটি চিঠিতে) 'বুলাবাবু, তোমার কাছে সানুনয় অনুরোধ - এঁদের একটু দরদ দিয়ে, একটু রস দিয়ে গান শিখিয়ো - এইটেই আমার গানের বিশেষত্ব। তার উপরে তোমরা যদি স্টিম রোলার চালিয়ে দাও, আমার গান চেপ্টা হয়ে যাবে। আমার গানে যাতে একটু রস থাকে, তান থাকে, দরদ থাকে ও মীড় থাকে, তার চেষ্টা তুমি কোরো।" ('সঙ্গীত চিন্তা') রাগসঙ্গীত ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ কিছু পাশ্চাত্ত্য গানের সুর নিয়ে সরাসরি তাতে কথা বসিয়েছেন। যেমন 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে', বা 'পুরানো সেই দিনের কথা', 'কতবার ভেবেছিনু' ইত্যাদি সবশুদ্ধু বারোটি গান। এখানে বোধহয় প্রকাশিত স্বরলিপি-র (যদি একটির বেশি চালু থাকে তবে সবকটিই) বাইরে যাওয়া চলে না। এছাড়া রয়েছে বাংলা লোকসঙ্গীতের বিশেষতঃ বাউল ও কীর্তনের সুর। যা তিনি বহু গানে ব্যবহার করেছেন। যেমন, 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা

মাটির পথ', বা 'ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়', 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে' ইত্যাদি। এখানে সুরবিহার সম্ভব কিনা সেটা তর্ক সাপেক্ষ। আর এসবের বাইরে, যা রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টি, যে গানগুলিকে কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না, যা স্পষ্টতঃই তাঁর নিজস্ব ভাবনার ফসল, তেমন গান, যথা, 'পরবাসী এসো ঘরে', 'বাজিল কাহার বীণা', 'মম চিত্তে, নিতি নৃত্যে' বা 'যদি তারে নাই চিনি গো'

এরকম আরো বেশ কিছু গান - এই গানগুলি পুরোপুরি composition-এর মর্যাদা দাবি করে। এবং সে ক্ষেত্রে আমার মত সাধারণ শ্রোতার মনে হয় যে শিল্পীকে স্রষ্টার দাবি পুরোপুরি মেনে নিতে হবে, স্বরলিপির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। কারণ এইগুলি একেবারে রবীন্দ্রনাথের নিজের সৃষ্টি। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়। যে প্রশ্ন সত্যজিৎ রায় তুলেছেন। সেটি গানের orchestration বিষয়ে। সত্যজিৎ রায় লিখেছেন, 'আরেকটা জিনিস যেটা স্বরলিপিতে পাওয়া যাবে না সেটা হল গানের সংগতের নির্দেশ। সঙ্গত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু বলে যান নি। এখানে সুরকারের একটা বড় দায়িত্ব তিনি পালন করেন নি।' ('রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভাববার কথা') মোটামুটিভাবে ওনার গানে ছড় টানা তারের যন্ত্রের বা টঙ্কারে বাজানো তারের যন্ত্র যথা সারেঙ্গী, এস্রাজ, সেতার, দোতারা ইত্যাদি এবং তবলা, পাখোয়াজ ও খোলের মত তালবাদ্যর ব্যবহার দেখা যায় প্রথম দিকের গানের রেকর্ডগুলিতে। অথচ এই নিয়েও গন্ডগোল কম হয়নি। বিশ্বভারতী music board স্বয়ং দেবব্রত বিশ্বাসের মত শিল্পীর গানের রেকর্ড না-মঞ্জুর করেছেন কারণ উনি "এসেছিলে তবু আসো নাই" এবং "মেঘ বলেছে যাব যাব" গান-দুটি কিছু আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে musical interlude ও Echo Chamber ব্যবহার করে গেয়েছিলেন। কারণ হিসেবে চিঠিতে লেখা ছিল, "Awfully melodramatic voice productions. Echo-Chamber which seems to have been used have utterly spoiled the fine note combinations in the song." একথাতে বিশেষ কিছুই পরিষ্কার হয় না। কারণ কোনটা melodramatic সেটা বোঝার মাপকাঠিটি ঠিক কি ছিল? তা কিন্তু একেবারেই স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ তো এব্যাপারে কোন স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে যান নি। পরে অবশ্য দেবব্রতর সেই গান অনুমোদন পায়। কিন্তু একাধিকবার এই খবরদারির ফলে দেবব্রতর মত শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করাই বন্ধ করে দিলেন। এখন তো রবীন্দ্র সঙ্গীতে অজস্র ধরণের arrangement করা হয়ে থাকে অনেক ধরণের যন্ত্রের সহযোগে এবং লম্বা লম্বা interlude-এর ব্যবহার করেন খ্যাতনামা শিল্পীরাই। তাহলে যা দাঁড়ালো, তা হল এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত কোন অক্ষয়-অব্যয় ধ্রুব স্বরলিপি সমষ্টি নয়। তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ চোখে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি রূপ থেকে অন্য রূপটির তারতম্য যথেষ্ট পরিস্কার। যেমন রবি ঠাকুরের বেশ কিছু গান মুক্তছন্দে গাওয়া হয় আজকাল। সর্বমান্য শিল্পীরাই গেয়েছেন। রবীন্দ্রভারতীর এককালীন স্বরলিপি অধিক্ষক শ্রী সুভাষ চৌধুরি একটি তালিকা করেছেন প্রায় ৮৯-টি গানের যাদের স্বরলিপি তাল বা নির্দিষ্ট মাত্রা নিবদ্ধ কিন্তু তা মুক্তছন্দে গাওয়া প্রচলিত। এমন কী, 'এ পরবাসে' গানটি যা আমরা মুক্তছন্দে অনেকের কণ্ঠে শুনেছি, সেটি মালতী ঘোষাল তাল ও ছন্দে নিবদ্ধ করে গেয়ে রেকর্ড করেছেন। এই সমস্ত দেখেশুনে আমার মত সাধারণ শ্রোতার মনে হয় যে রবীন্দ্রনাথই এদেশে প্রথম যিনি হয়ত তাঁর গানের একটু সুস্পষ্ট রূপ দিতে চেয়েছিলেন য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসরণে নির্দিষ্ট সুর, তাল ও লয় বেঁধে দিয়ে। কিন্তু গান রচনার ক্ষেত্রে সেটা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি যেহেতু উনি গানের সুরের, তালের এবং লয়ের ভিত্তিটা এদেশের গান থেকেই নিয়েছিলেন মূলতঃ, যার ধরণটাই স্বাধীনতাকামী। তবে কাব্যের অংশে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশী স্বতন্ত্র ছিলেন প্রথম থেকেই এবং সুরের ক্ষেত্রেও আস্তে আস্তে প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে নিজস্ব একটি রূপ দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর গানের অবিকৃত রূপ শুধুমাত্র স্বরলিপি ধরে মিলবে না। আমাদের রাস্তাটা দেখাবেন রবীন্দ্রসংগীতের প্রথমদিকের শিল্পীরা। তাঁদের গাওয়া গানগুলিকেই আমাদের আদর্শ ভেবে এগোতে হবে। যেখানে সেটা সম্ভব নয়, সেখানে স্বরলিপিকে মূল হিসেবে ধরে, রবীন্দ্র ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁর ভাব, ভাষা এবং বাংলা উচ্চারণ বিধির সম্বন্ধে সচেতন থেকে খোলা গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে (অর্থাৎ cronning না করে, চিবিয়ে, ঠোঁট টিপে উচ্চারণ না করে) গাইতে হবে। রবীন্দ্র সংগীত কে কোন committee বসিয়ে বাঁচানো যাবে না। কোন প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায়ী আয়োজনেও তাকে বাঁধতে পারবে না। তার ঐতিহ্যকে আমাদেরই বাঁচিয়ে রাখতে হবে, ভালবেসে, যত্ন নিয়ে। তাই 'রবি বাবুর গান' ভালবেসে গান। সচেতন হয়ে গান। অনুভব করে গান।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই

শুভা আঢ্য

উত্তর ইংলণ্ডের হিমেল সমুদ্রের কোলে ছোট একটি শহর, সান্ডারল্যান্ড। এখানে শীতের আধিপত্য বারোর মধ্যে প্রায় ন'মাস। অক্টোবরের শেষাশেষি আসন্ন সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নামে লম্বা লম্বা পাইন গাছের গা বেয়ে দুপুর বেরোতে না পেরোতেই। লাল কাঁকড়ের রাস্তার শেষে, ''আইভি কটেজের'' পাতা ঝরা গোলাপের ঝাড়গুলি আর শুকিয়ে যাওয়া ঘাসের লন কনকনে হাওয়ায় থরথরিয়ে কাঁপে। বিকেলের সংগে সংগে ঘন কুয়াসায় আশেপাশের বাড়িগুলি একটু একটু করে মুছে যেতে থাকে আর কালো আকাশের কম্বল টেনে নিয়ে গুটিশুটি মেরে পৃথিবী ঝিমিয়ে পড়ে।

বাইরের ঘন হয়ে আসা অন্ধকার কটেজের জানলার কাঁচ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়াতে হাতের চা-এর কাপ সোফার পাশের একটি ছোট টেবিলে নামিয়ে রেখে জেনিফার ওরফে জেনি আমাকে সোফাতে বসতে আহ্বান জানায়। বাইরে থেকে হাওয়ার শনশনানি কানে আসে। ফায়ারপ্লেসের গনগনে লালচে আলো বাইরের কালো হাড় কাঁপানো শীতকে যেন দু'হাত দিয়ে আটকে রাখতে চায়। জানলার ভারী আইভরী রং এর পর্দাগুলো টানতে টানতে জেনি বলে ওঠে, "I think it may snow tonight" - মরশুমের কিছু আগে হলেও, হতে পারে। ঘরের দেওয়ালে তার কথাগুলি হাল্কা প্রতিধ্বনি তোলে। আমার কোলে জেনি একটা ছোট লাল ল্যাপ-রাগ চাপা দিয়ে বলে – এতে আরাম পাবে, আমারও ভালো লাগে।"

হাতের কাছের টেবিল ল্যাম্পের সুইচ টিপে দিতে নীলাভ আলো ছড়িয়ে পড়ে সুরুচি পূর্ণ সাজানো বসার ঘরে। দুধসাদা সোফার ওপর ক'টি রাজস্থানী কাঁচের কাজ করা লাল কমলা কুশন। পায়ের কাছে মাঝারী মাপের নরম কাশ্মিরী কার্পেট। তার ওপর কারুকার্য করা মেহগনী কাঠের নিচু কফি-টেবিলে একটি শ্বেতপাথরের তাজমহলের নিঁখুত ছোট্ট মডেল। ঘরের কোণে পিয়ানোর ওপর স্ফটিকের ফুলদানিতে নানা রং এর টাটকা ফুলের গোছা। ডানদিকে গাঢ় চা রং দেওয়ালে ম্যাতিসের পেন্টিং। বাঁ দিকের দেওয়ালে একই রং তবে বেশ কিছুটা হাল্কা। ছোট বড় ছবির ফ্রেমে অনেকগুলি ফটোগ্রাফ এই দেওয়ালে রুচি পূর্ণ ভাবে সাজানো।

– সমুদ্রের ধারে বালির ঘর গড়তে ব্যস্ত ছোট্ট ছেলে।

– গোলাপের বাগানে ফোটা ফুলের মতই ফুটফুটে গোলগাল একটি শিশুর কচি মুখ খুশির হাসিতে উদ্ভাসিত।

– প্যারিসের আইফেল টাওয়ারে জেনীর সোনালী চুলে শেষ সূর্যের আলোর ছটা।

সব ছবিগুলিই সুন্দর কিন্তু এই দেওয়ালের একটি ছবি সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

– রুপালী ফ্রেমের মধ্যে বিয়ের সাদা গাউনে জেনি ও তার পাশে কালো স্যুট ও লাল টাইতে একটি যৌবনোজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত হাসিমুখ। জেনির পাশে ডক্টর বিজন বোস। সান্ডারল্যান্ডের স্বনামধন্য হৃদরোগ বিশারদ। বিজন শুধু ডাক্তার হিসেবেই সুনাম অর্জন করেননি এই দেশে, আপনপর সবার মনে স্থান করে নিয়েছিলেন সুন্দর স্বভাবের জন্য।

জেনি একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ছবিটির দিকে, তারপর সোফাতে বসে টেবিলে রাখা ডায়েরী তুলে নিয়ে পাতা উলটোতে থাকে। কয়েকটা পাতা এপাশ ওপাশ করার পর আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে – ''শুনবে আমার গল্প?'' উত্তর দিই – ''সেইজন্যেই তো আজকের এই সন্ধ্যা''।

জেনির কথাগুলি যেন ভেসে চলে এক শান্ত বহমান ছোট নদীর মত।

– ''বিজনের কাছেই শোনা, বিজু এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। প্রখর বুদ্ধি ও অপরিসীম অধ্যবসায়ের ফলে ভারতবর্ষে মেডিক্যাল কলেজের গন্ডী পার হয়ে মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে এসেছিলো, স্কটল্যাণ্ডের এডিনবারা ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল কলেজে। সেখান থেকে সসম্মানে পাশ করে বেরিয়ে লণ্ডনে

কিছুদিন হৃদরোগ নিয়ে রিসার্চ করার পর সেখানকার ব্যস্ত জীবনধারায় বিরক্ত হয়ে, শান্ত বাতাবরণ আর ছবির মত সুন্দর সান্ডারল্যান্ডের হাসপাতালে কাজ নিয়ে চলে এসেছিল। ছয় দাদা ও তিন দিদির শেষে সবচেয়ে ছোটো বিজু চিরকালই লাজুক ও মুখচোরা ছেলে। অতি অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে সে আরোই নিজেকে সবার চোখের আড়ালে সরিয়ে রাখতে শিখেছিল। কেন যেন তার মনে হ'ত ঐ বিরাট পরিবারের নিরন্তর কোলাহলে সে হারিয়ে যাবে। তার জগৎ ছিল একার। লন্ডনের ভিড় ভালো লাগতো না ঠিকই কিন্তু সান্ডারল্যান্ডে এসে সে একাকীত্ব বেড়ে উঠেছিল। সান্ডারল্যান্ডের ছোট শহর, তার একটুখানি পরিধি দেখে নিতে বেশি সময় লাগেনা আর একটু শীতকাতুরে বলে তার বাইরে বাইরে ঘুরতেও ভালো লাগতো না। হাসপাতালের কাজের শেষে ছোট্ট ফ্ল্যাটে ফিরে আর কিছুই করার থাকতো না। দেশের সবার জন্য মন কেমন করলেও সেখানে অল্প দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়ার কথা ভাবাও যেত না। দেশে যাওয়া তখন এখনকার মত সহজ ছিল না তাছাড়া ব্যয়সাধ্যও। এই অবস্থা যখন প্রায় অসহ হয়ে উঠেছে সেই সময়েই ওর আমার সংগে দেখা।"

জেনি হাতের কাছে রাখা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলে – জানো, সেই সকালটির কথা ভাবতে গেলে আমার মনে হয়, এই তো সেদিন। সবে হাসপাতালের প্রতিদিনের ব্যস্ত জীবন শুরু হয়েছে। ডক্টর বোস রাউন্ডে, ছাত্র-ছাত্রীর ছোট একটি দল ছাড়াও নিয়মিত সংগী নার্স মার্থা ছুটিতে থাকার দরুন ডিউটিতে অন্য ওয়ার্ডের নতুন নার্স –আমি!

জেনির দিকে তাকিয়ে আমি এবার সেদিনের সেই নতুন নার্স জেনির কথা ভাবতে চেষ্টা করি। ছোট-খাট ছিমছাম দেহ, মাথার সাদা ক্যাপের নীচে লাল চুলের আভাস। চোখে ইংলণ্ডের উত্তর সমুদ্রের নীলাভ সবুজ রং, দীপ্ত মুখে আত্মবিশ্বাসের ছাপ। সব কিছু মিলিয়ে বেশ আকর্ষণীয়া।

জেনি বলে চলে, ডক্টর বোস চলতে চলতেই সামান্য হেসে মাথা হেলিয়ে তাকে স্বাগত জানালে সেও তেমনি প্রত্যুত্তর দিলো। দুটি রোগীর কাছে গিয়ে তাদের শরীরের খুঁটিনাটি নিয়ে ও চিকিৎসার আলোচনা করে দলটি গিয়ে দাঁড়াল ওয়ার্ডের বয়স্কা এক ভদ্রমহিলার বেডের পাশে। প্রথম কুশলাবাদ করবার পর তার হার্টের অবস্থা দেখবার জন্য নার্স জেনির দিকে হাত বাড়িয়ে ডক্টর বোস বললেন – "স্টেথিসস্কোপ"। জেনি তার হাতে ধরা স্টেথিসস্কোপটি ধরে রেখেই, চোখে চোখ রেখে বলল - "Please" ডক্টর বোস একটু অবাক হয়ে আবার বললেন – "Stethescope"। জেনি যেমন ছিল তেমনি থেকেই আবার বলে উঠলো – "Please"! এতক্ষণে ডক্টর বোস সহ পুরো দলটিরই নজর জেনির দিকে। ডক্টর বোস বয়সে না হলেও একাধারে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের কর্ণধার ও হাসপাতালের প্রধান পরিচালক। তাঁর সংগে একি পরিহাস? পরিস্থিতি বেশ কিছুটা সিরিয়াস হয়ে উঠছে দেখে সবাই সন্ত্রস্ত কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ রোগিনী মহিলা শব্দ করে হেসে ওঠাতে সকলে একসংগে তাঁর দিকে ফিরে তাকালো। তিনি বলে ওঠেন – "She wants the magic word from you, Dr. Bose, that's all" – তারপর স্মিত হেসে জেনির দিকে তাকালেন। এবার ডক্টর বোসও সশব্দে হেসে উঠলেন ও নার্সের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন - "Stethescope, PLEASE?" বর্ষীয়সী রোগিনীটি সস্নেহে ডক্টর বোসের দিকে তাকিয়ে বললেন, – "There you go! Thank you much, Dr. Bose". আমার মুখের একটুখানি রক্তিমাভা হয়তো কারো কারো চোখে পড়েছিলে। ডক্টর বোস এরপর কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন ও রাউন্ডের শেষে নিজের অফিস গরের দিকে রওনা দিলেন। সেদিন কাজের শেষে ডক্টর বোসের ঘরে আমার ডাক পড়েছিল। আমি ভেবেই নিয়েছিলাম সকালের ঘটনার ব্যাপারেই আমার ডাক পড়েছে। যেতে যেতেই তাই বাছা বাছা কিছু উত্তরও ঠিক করে নিচ্ছিলাম। কিন্তু আমাকে অবাক হতে হয়েছিল শেষ পর্য্যন্ত। ঘরে ঢুকতেই ডক্টর বোস তাকে বসতে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, সকালে জেনি তাঁকে একটি সাধারণ কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় সৌজন্যরীতি মনে করিয়ে দিয়েছে বলে তিনি তার কাছে কৃতজ্ঞ। একটু ক্ষণের জন্য আমার মনে হয়েছিল হয়তো ডক্টর বোস উপহাস করেছেন কিন্তু আমার সে ভুল ভাঙ্গতে দেরি হয়নি, ডক্টর বোসের চোখের দিকে তাকিয়ে। সেই দুটি উজ্জ্বল কালো চোখে কোনো ছলনা ছিল না।

সেখানের শুচি শুভ্র নির্মলতায় প্রকাশিত ছিল, যে তাঁর মনের আর মুখের ভাষায় কোনোও প্রভেদ নেই।

জেনি ডায়েরীর পাতায় চোখ নামিয়ে পড়তে শুরু করে। – উত্তর ইংল্যান্ডের যে ছোট্ট শহরতলীতে আমি বড় হয়েছি, সেখানের মানুষরা নিজেদের পরিধির বাইরের পৃথিবীর সম্বন্ধে খুব একটা খোঁজখবর রাখে না। সাত সমুদ্র পারে ভারতের সম্বন্ধে আমার কোনো ঔৎসুক্য ছিল না কোনোদিন। কিন্তু এই ঘটনার পর এই সুদর্শন, প্রতিভাসম্পন্ন অথচ সংযত, সহজ মানুষটির বিষয়ে সব কিছু জানতে আমার মন উদ্বেল হয়ে উঠল। দিনে দিনে সময় এগিয়ে গেছে আর কাজের মধ্যেই আমরা কখন যে একজন আরেক জনের কাছে অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছি তা জানতেও পারিনি। যখন সেই সত্যটি দু'জনের মনে রাতের আকাশের ধ্রুবতারাটির মত উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠলো তখনই সমাজের যত বাধা বন্ধন সহস্র নিষেধের অঙ্গুলি তুলে আমাদের মিলিত হবার পথ রোধ করে দাঁড়াল। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে, দু'দিকের দুটি সংসারে একই আপত্তির ভাষা উচ্চারিত হতে লাগল, – "ওদের সংগে আমাদের কোনোও মিল নেই। এ হতে পারেনা, এ আমরা মেনে নিতে পারিনা! সংস্কারের অনড় রীতির কাছে বিনতি, অনুরোধ, উপরোধ কোনও কাজেই লাগল না। আমাদের সামনে একদিকে সমাজ ও আত্মজনের দাবী অন্যদিকে মিলনপ্রয়াসী মনের ব্যগ্র দুর্দম আকুলতা। শেষ পর্য্যন্ত জিত হ'ল ভালবাসার তবে মূল্য দিতে হ'ল চিরদিনের স্নেহের বন্ধনকে ছিন্ন করে। শুধু ক'জন বন্ধু ছাড়া আর কেউ যোগ দিলো না আমাদের ছোট্ট মিলনোৎসবে।

হাসি-কান্নার হীরে-পান্নার পথ ধরে শুরু হলো যুগল চলা, আগামী দিনের আশার সুরে সুর বেঁধে।। বাঁধা হোলো ঘর। আমাদের ছোট্ট কটেজের বাগানে ভোরের আলোয় প্রস্ফুটিত গোলাপের ফুলগুলি তাদের রক্তিম দল মেলে ধরতো সূর্যের দীপ্ত আলোকে। সন্ধ্যায় আকাশের তারাগুলি সকৌতুকে দেখতো দু'টি অনেক দূরের কাছে আসা মানুষের সুখের স্পন্দনে রঞ্জিত মুহূর্তগুলি। কখনো উচ্ছলিত প্রনয়ে, কখনো গভীর অভিমানে, আবার কখনও ছেলেমানুষী কৌতুকের লিপিকাতে প্রতিদিন রচিত হতো এক নতুন কাহিনী।

বিজু নিজের কাজে ব্যস্ত থাকলেও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের দিকে। ওর আমাকে কিছুই অদেয় ছিল না। ওর নিজের তেমন ইচ্ছে না থাকলেও আমারই আগ্রহে সে আমাকে নিয়ে গেছে সে সুদূর ভারতবর্ষে। আমি আমার বিজুর সঙ্গে সেই বিশ্ববিখ্যাত প্রেমের সমাধি তাজমহল দেখেছি। চাঁদের আলোয় ধোয়া সে কি এক মহা বিস্ময়!! বিজু আমাকে অনুবাদ করে শুনিয়েছে তাজমহলকে নিয়ে লেখা তাদের দেশের এক মহাকবির লেখা কবিতার কিছু অংশ। - A drop of tear on the face of eternity! কি অপূর্ব রচনা। রিন রিন করে এবার ফোনটা বেজে উঠতে জেনি চমকে ওঠে। তার বন্ধু মার্থা, খোঁজ নিচ্ছে জেনি কেমন আছে। জেনি তাকে আশ্বস্ত করে বলল, সব ঠিক আছে।

ফিরে এসে জেনি বলতে থাকে - জানো ভারতে গিয়ে আমাদের আরো একটি লাভ হয়েছিল। বিজুর আত্মীয় স্বজন যারা আমাদের বিয়ের বিপক্ষে ছিলেন তাঁরা সকলেই আমাকে আপন করে নিয়েছেন। এমন কি বিজুর বৃদ্ধা মা আমাকে একটি সুন্দর সোনার হার দিয়েছেন। আসল সোনার। ইংলন্ডে বোধহয় বাকিংহাম প্যালেসের অধিবাসিরাই আসল সোনার গয়না পরে!! আর পরি আমি!! আর একটা মজার ঘটনা বলি তোমাকে। আমি বিজুকে যখন আমার বাড়িতে প্রথম নিয়ে যাই তখন সবাই খুব চাপা উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষের লোক কেমন হবে এই সব কথা ভেবে। বিজুকে দেখে, তার সঙ্গে আলাপ হবার পর আমার বোন আমাকে আড়ালে ডেকে বলেছিল – "এতো আমাদেরই মত হাঁটে চলে, খায়, কথা-টথা বলে, আশ্চর্য, তাই না?" জেনির মুখে স্মিত হাসি। ঘরে দেওয়ালে টাঙ্গানো 'কোকিল-ঘড়ি' মিষ্টি সুরে জানান দিলো, সময় সাড়ে পাঁচটা। উঠে গিয়ে জানলার পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখলাম মনে হোলো গভীর রাত। জেনি বলল, – এখনও ছটাও বাজেনি, কিন্তু মনে হয় যেন রাত দুপুর। অবাক লাগছে তাই না? বিজুর এইটা একটুও ভালো লাগতোনা। সে এতদিন এ দেশে থেকেও শীতকালটাকে কিছুতেই ভালোবাসতে পারেনি।

জেনি আবার ডায়েরীতে মনোনিবেশ করে। পাতার পর পাতায় লেখা কত সুখ দুঃখের কথা। জেনির সেই পাতাটিকে হাত এসে থামে যেখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে – TOTAL DISAPPOINTMENT! এই দিনেই জেনি জেনেছিল সে কোনদিন মা হতে পারবে না। তার ডাক্তারের একটি কথায় সেই রৌদ্রোজ্জ্বল দিনটিতে অসময়ে

নেমে এসেছিল এমনই এক শীতল সন্ধ্যার ঘন অন্ধকার। লেখা আছে, - আজ বিজু আমাকে পরম যত্নে ঘিরে রেখেছিল। আমার কান্না মুছিয়ে দিয়ে বার বার বলেছিল তার আমাকে ছাড়া আর কিছুই কাম্য নেই। আমাদের দু'জনের এই ছোট্ট জগৎ, এই তার স্বর্গ। তবু আমার মনে হয়েছিল আমি অপূর্ণ, আমি সেই দীপটি জ্বালাতে পারিনি যাতে আমাদের ভালবাসায় পড়া এই সংসারটি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, ভরে উঠতো আরেক স্বর্গীয় আনন্দে। বিজু আমার জীবনে যে পরম সুখ এনেছে তার কোনও সীমা নেই তবু আমার মন কাঁদে দু'টি কচি হাতের ছোঁয়া পাওয়ার জন্য। কেন, কেন আমার মাতৃ হৃদয় থাকবে চির তৃষিত? কে আমাকে এনে দেবে সেই অমৃত পরশের স্বাদ?

জেনি যেন এখনও সেই অশান্ত মনকে অনুভব করতে পারে। সে অশান্ত পায়ে পায়চারি করতে থাকে। ঘরের স্তিমিত অন্ধকারে মনে হয় সে এক ছায়া শরীর। দূরে শোনা যায় কোনও রাতের যাত্রীবাহি ট্রেনের চাপা আওয়াজ। জেনি বলতে থাকে, সেদিন আমি ভেবেছিলাম মা হতে না পারার দুঃখই বুঝি চরম দুঃখ। আমার মনের মধ্যে অহরহ এক যন্ত্রণা আমাকে রক্তাক্ত করে তুলতো। বিজু আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইতো, আমাকে স্বান্তনা দিতো আর উজাড় করে দিতো তার ভালবাসার অর্থ। আমার মন মানেনি। আমার শূন্য দুটি হাত চাইতো একটি শিশুর ছোঁয়া, আমার সমস্ত চেতনা উদগ্রীব হয়ে থাকতো মা ডাক শোনার জন্য। আমাকে সুখী করবার জন্যই বিজু রাজি হয়েছে দত্তক নিতে। একটি ছোট্ট মেয়ে ও ছেলে, পরপর আমরা দু'টি শিশুকে পেয়েছি আমাদের জীবনে। তারা আমাকে পরিপূর্ণতার আস্বাদ দিয়েছে, ভরে তুলেছে আমার শূন্য জীবন। আমার মনে এসেছে শান্তি।

- জেনি ফিরে গেছে তার স্মৃতি রোমন্থনে। দিনলিপির পরের পাতাগুলিতে গতানুগতিক জীবনের কাহিনী লেখা। বাচ্চারা বড় হচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে। তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা, কিছু সমস্যা, কিছু মনঃক্ষুন্যতা। এছাড়া আছে নানা দেশ ভ্রমণের সবিশেষ বর্ণনা। একবার স্পেন এ ছুটি কাটাতে গিয়ে তাদের এতই ভালো লেগেছে, যে তারা কিনেছে একটি ছোট summer cottage ও প্রতি বছরই সেখানে গিয়ে ছুটি কাটিয়েছে। সাধারণ এক সুখী পরিবারের ওঠা-নামার কাহিনী। একটু চুপ করে থেকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সে এক সুখের স্মৃতিতে। জানো, আমাদের পঁচিশ বছরের বিবাহ বার্ষিকীতে বিজু আমাকে নিয়ে গেছে আমার স্বপ্নের শহর প্যারিসে। Seine নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছে নীল-সবুজ পান্নার আংটি। বলেছে, তোমার চোখের রং কিন্তু এই পান্নার চেয়েও সুন্দর! চোখ বুজে জেনি যেন হারিয়ে যেতে থাকে সেই স্বর্ণালী সন্ধ্যার মায়ায়। বলে, আমার জীবনের সে এক দুর্লভ মুহূর্ত্ত! সেই একটি ক্ষণ, অসীম কালের ছোট্ট একটি টুকরো, আমার জীবনের মহা সন্ধিক্ষণ। আমি কিছু না বলে শুনতে থাকি তার কথা।

আবার পাতা ওলটাতে থাকে জেনি তারপর এক সময় থামে। কিছু না লেখা পাতার নিরাবরন শূন্যতার ওপর হাত রেখে সোফার পিঠে মাথাটা এলিয়ে দেয়, মনে হয় অনেক ক্লান্তিতে। নিমিলিত চোখের আড়ালে, যা কাউকে দেখানো যায় না, সেই ভার বওয়া শ্রান্ত মনও বুঝি লুকিয়ে থাকে। চোখ বুজে জেনি আপন মনেই বলে - আমার মনে হয় জীবনে কিছুই সহজ হয় না। যখনই মনে হয় এই বুঝি সোজা পথের যাত্রা শুরু হ'ল, তখনই বাধার রূপে দেখা দেয় দূরন্ত চড়াই না হয় অন্ত হীন খাদ! আনন্দের পশরাটি যেন সাজানো থাকে দুঃখের সাজিটিতে।

চোখ নামিয়ে আবার পড়তে থাকে জেনি। পাতার পর পাতা উলটে যায় নিজের মনে। তারপর বলে, এরপরই আমাদের জীবনে এলো ঝড়। আচমকা সেই ঝড় আমাদের সাজানো ভেঙ্গেচুরে ছারখার করে দিলো। সবুজের শ্যামলিমা হারিয়ে গেল এক মরুভূমির উষর রুক্ষতার আবরণে। দিনলিপিতে পাতার পর পাতায় প্রতিদিনের দুর্ভাবনার তালিকা।

- বিজুর স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনার আর শেষ রইল না।

- বিজু ভালো থাকছে না। কি যে হয়েছে কোনও ডাক্তারই বুঝতে পারছে না। বিজু নিজেও নয়।

- বিজুকে লন্ডনে ভর্ত্তি হতে হোলো। পরীক্ষার পরীক্ষা চলল দিনের পর দিন।

- শেষে এলো সেই ভয়ঙ্কর দিন। চিকিৎসক রায় দিলেন, – Diagnosis Multiple Sclerosis!

এরপর থেকেই শুরু হয়েছে ডায়েরীতে লেখা জেনির যুদ্ধের ইতিহাস। এই দুরারোগ্য ব্যাধির অসম্ভব পরিণতির সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম। জেনি বলে চলে, "এতদিন বিজুই ছিল আমার জীবনের কর্ণধার। তার বলিষ্ঠ দু'টি বাহুর আবেষ্টন আমাকে পৃথিবীর সব বাধা বিপত্তির থেকে সযত্নে রক্ষা করেছে। বিজুর হাত ধরেই আমি চলেছি গত ২৫টি বছর ধরে। কোন এক অদৃশ্য অকরুন বিধাতার পরিহাসে এখন থেকে আমাকেই করতে হবে বিজুর সমস্ত ভার বহন। ভারাক্রান্ত গলায় জেনি আমাকে জিজ্ঞাসা করে -- তুমি কি Multiple Sclerosis সম্বন্ধে কিছু জানো? উত্তর দিই - জানি যে এই অসুখে মানুষের শারীরিক শক্তি কমতে থাকে, হাঁটা চলার ব্যাঘাত ঘটে, এইটুকুই। জেনি মাথা

নেড়ে বলে - কিছুটা তাই, তবে আরো অনেক দুঃসহ, কষ্টকর। এই রোগ মানুষের nervous system কে attack করে ও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ শরীর Paralysis এ আক্রান্ত হয়। সাধারণতঃ ঠাণ্ডা দেশের মানুষদের মধ্যেই এর প্রভাব বেশি দেখা যায়। বিজু ছিল ভারতবর্ষের মানুষ। সেইজন্যেই বিজুর চিকিৎসকেরা কিছুতেই diagnosis করতে পারছিলেন না যে সে MS এর রোগী। সব থেকে দুঃখ এই যে এ রোগের কোনোও প্রতিকারের পন্থা আজও জানা নেই। আমরা দু'জনেই medical field এর লোক, আমরা জানতাম এর পরিণতি কি ভয়ানক তবুও একে আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছি Clinic থেকে clinicএ, ডাক্তার থেকে ডাক্তারের দরজায় দরজায়। জেনি দু'হাতে মুখ ঢাকে। আমি উঠে গিয়ে তার পাশে বসে জড়িয়ে ধরি। জেনির বহুদিনের জমাট অশ্রু অঝোর ধারায় ঝরে পড়তে থাকে। এমনি কতক্ষণ আমরা বসেছিলাম মনে নেই তবে একসময় জেনি থেমেছিল আর ম্লান হেসে বলেছিল - আমার গল্পের এখনও কিছু বাকি আছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুমি যদি চাও আমি আর একদিন তোমার কথা শুনতে পারি। জেনি মাথা নেড়ে বলেছিল আজ আর থামতে ইচ্ছা করছে না, আর একটু পড়ি, আর একটু বলি। বুঝতে পেরেছিলাম সে সন্ধ্যায় জেনির মন ডুবে গেছে এক নিভৃত অশ্রুর সাগরে যেখানে দুঃখ বেদনার সংঘাতে লেখা হচ্ছে একটি না বলা কাহিনী, যার শেষ অধ্যায় পর্যন্ত না পৌঁছলে থামা যাবে না।

জেনি বলতে থাকে, এই ডায়েরীটার পাতায় পাতায় লেখা আছে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস। প্রথমে ভেঙ্গে পড়লেও বিজু আবার হাল ধরলো আমাদের নিমজ্জমান তরীটির। প্রথমে হাসপাতালের দায়িত্ব তার পর ছেলেমেয়ে ও আমার ভবিষ্যৎ এর সংস্থান নিয়ে ব্যস্ত রইল কিছুদিন। কি অসম্ভব ধৈর্য আর মনোবলের প্রতীক। তার অসুস্থতার কথা জানবার পর শত শত হৃদরোগের patient এসে তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য ভিড় জমাতো হাসপাতালে। তাদের একটিই আকুতি। একবার ডক্টর বোসের সঙ্গে দেখা করবে, একবার তাঁর সঙ্গে কথা বলবে! সেই সব ভয় ভীত রোগ পীড়িত মানুষদের জন্য বিজুর কি মমতা। নিজের সব কষ্টকে উপেক্ষা করে তাদের দিয়েছে সান্ত্বনা, দিয়েছে আশ্বাস। তারপর তার শরীরে নেমে এসেছে পক্ষাঘাত, অচল হয়ে গেছে একের পর এক অঙ্গ, করেছে তাকে অশক্ত, নির্বল। শুধু কথা বলতে পারা ছাড়া আর তার কোনো কিছু করারই উপায় ছিল না তবু আমি কোনোদিন তার কাছে কোনোও অভিযোগ শুনিনি। তার মুখের হাসিটি ছিল অনির্বান। আমি যখন ক্রোধিত হয়ে ভগবানকে দোষ দিয়েছি, বিজু আমাকে স্বান্তনা দেবার যথাসাধ্য প্রয়াস করেছে। আমাদের জীবনের আনন্দ ভরা সময়ের কথা শুনিয়েছে। বিজু এমনি করে বেঁচেছিল দীর্ঘ পনেরো বছর। এ সময়ে আমি তাকে শিশুর মতো সেবা করেছি, করতে পেরেছি এই আমার মহা সৌভাগ্য বলে আমি মানি। যখন তার যাবার সময় এলো সে আমারই দু'টি হাতের বেষ্টনে শেষ নিঃশ্বাস নিয়েছে। তার শেষ কথা ছিল - "জেনি, আমার কারোও কাছে কোনোও অভিযোগ নেই শুধু একটি প্রার্থনা আছে। আমি চাই আমি চলে যাবার পরেও যেন তুমি জীবনে একা না যাও।" আমার কোনও উত্তর না শুনেই সে চলে গেছে। তাকে বলতে চেয়েছিলাম - আমার এই একলা ঘরেও আমি একলা থাকবো না বিজু। আমার গভীর বেদনার বিন্দু বিন্দু অশ্রু, আমার ভালবাসার ঐশ্বর্য্য, আমার তার সঙ্গে তিলে তিলে গড়া অতীতের সব স্মৃতি আমাকে ঘিরে রাখবে। কিছুই বলা হয়নি, বিজু চলে গেছে কোন অজানা এক নিরুদ্দেশ ঠিকানায়। বিজুর ইচ্ছামতো তার অস্থি আমি নিয়ে গেছি ভারতের পুণ্য নদী গঙ্গাতে বিসর্জন দিতে। আমার চোখের জলে ভেজা তার শেষ চিহ্ন ভেসে গেছে কল্লোলিনী গঙ্গার উর্মিমালার সঙ্গে। তারপর ফিরে এসেছি নিজের দেশে, নিজের বাড়িতে, যেখানে আমার বিজুর সহস্র চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ভেবেছিলাম আমি তার স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকতে পারবো। কিন্তু তার চলে যাওয়ার শূন্যতা যে কি কঠিন হবে সে আমি বুঝতে পারিনি। হালভাঙ্গা নৌকার মতো ব্যাথার সমুদ্রে ভেসে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। চার্চের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছি। শান্তির খোঁজে ছেলে মেয়ে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সময় কাটাবার প্রয়াস বৃথা হয়েছে। আজ বলতে বাধা নেই, একসময় নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথাও ভেবেছি।

জেনি থামে। ঘরের মধ্যে শুধু মাত্র ঘড়ির মৃদু টিক টিক আওয়াজ। আমার কানে জেনির কথাগুলি অনুরনন তুলতে থাকে। অনন্ত বিরহের এক সীমাহীন অন্ধকারে জেনি খুঁজে চলেছে তার হারিয়ে যাওয়া অতীতকে। তাকে স্বান্তনা দেবো কেমন করে, কি, ভেবে পাইনা, তাই চুপ করে থাকি।

জেনি এবার উঠে fireplace এর প্রায় নিভু নিভু আগুনটাতে আর একটি কাঠের টুকরো গুঁজে দিতে আগুনের তিন চারটি শিখা লাফিয়ে উঠলো আর ঘরে ছড়িয়ে গেল তার উত্তাপ। জেনির স্বগতোক্তি শুনতে পেলাম - "বিজু না থাকায় আমার সব কিছুই যেন নিভে গিয়েছিল। আমি এক তুষারের বোঝা বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছিলাম, মনটা জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল। কঠিন সত্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে করতে

হারিয়ে ফেলেছিলাম পথের দিশা, এক নামহারা অদৃশ্যের টানে ঘুরপাক খাচ্ছিলাম অন্তহীন গোলকধাঁধার অন্ধকার গহ্বরে। সেই সময়েই, ঠিক যখন মনে হচ্ছিল আর কিছুতেই এ বোঝা বয়ে চলতে পারবোনা তখন এলো এক বিশেষ আহ্বান। আমি তখন ভাবতে পারিনি এইটাই হবে আমার আরেক জীবনের প্রথম সূচনা। আমার দ্বিতীয় জন্ম! আমার জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চেয়ে জেনি বলে - আমার চার্চের একজন সদস্য একদিন আমাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন আমার কাছে প্রতি সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা সময় হবে কিনা। এক মাথা ধপধপে সাদা চুল, প্রায় ৬ ফুট লম্বা সৌম্য দর্শন মানুষটিকে আমি প্রায়ই দেখেছি চার্চের নানান কমিটির কাজে যোগ দিতে, চার্চের বিভিন্ন প্রয়োজনে এগিয়ে আসতে। আমার দ্বিধা দেখে শান্ত স্বরে বললেন – I have a feeling this project of the church will interest you. Would you please come to our meeting on Monday? কেন জানিনা আমার মনে হ'ল এ ডাকে আমার সাড়া দিতে হবে। তবু মুখে বললাম, কি project জানালে ভেবে দেখতে পারি। শান্ত হেসে বললেন – আমি সব information পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। পিছন ফিরে চলে যেতে যেতে কি ভেবে আবার ফিরে এলেন আর হাত বাড়িয়ে বললেন – আমার নাম Daniel Smith, আমাকে সবাই Dan বলেই ডাকে। আমি নাম বলার প্রচেষ্টা করতেই স্মিত হেসে বললেন – আমি জানি, You are Jeniffer Bose, Dr. Bose was my wife's physician. মার্থার কাছে পরে শুনলাম ভদ্রলোক সান্ডারল্যান্ডের কাছে সমুদ্রের ধারে 'ওয়েডসাইড' বলে একটি ছোট শহরে থাকেন। আমাদের চার্চে তিনি নতুন যোগ দিয়েছেন। প্রজেক্টের সব কিছু পড়ে ভালো লাগলো। একটি বাচ্চাদের Sunday School নির্মাণ করার জন্য আমাদের চার্চের প্রসারণ ও Fund raising এর প্রয়াস। নেমে পড়লাম কাজে। যেখানে এতদিন ছিল অখণ্ড অবসরে শুধু বিগত জীবনের ভগ্ন স্মৃতির কথা ভরা একটি ছেঁড়া পাতার মত উদ্দেশ্য বিহীন উড়ে উড়ে ফেরা, সেখানে এসে পড়লো আগামীর দিকে তাকাবার প্রেরণা, ব্যস্ততার সুস্থ সতেজ বাস্তবতা।

জেনি চুপ করে ঘরের আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইল একটুক্ষণ, তারপর বলল - চলো কিছু খাবার ব্যবস্থা করি, কি বলো? আমি গভীর আগ্রহে জেনির আগামী অধ্যায়ের কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম তবু মনে হ'ল সে যেন একটু বিরতি চাইছে। দুঃখের সাগর পেরিয়ে এসে মনে হয় পেয়েছে কুলের দেখা, আরো এগিয়ে যাবার আগে একটু থামার প্রয়োজন। দুজনে গেলাম কিচেনের দিকে। জেনির ছোট্ট সাদা কালো পশমের বলের মতো পিকানীজ কুকুর, Pixel, এতক্ষণ তার পায়ের কাছের কার্পেটের ওপর চুপটি করে ঘুমিয়ে ছিল। এখন সেও পায়ে পায়ে আমাদের সঙ্গে এলো। জেনি ইলেকট্রিক কেটলীতে জল গরম করতে দিয়ে ফ্রিজ থেকে প্লাস্টিকে মোড়া দু'টি স্যান্ডউইচ বার করলো। কিচেনের ছোটো গোল টেবিলে ন্যাপকিন, চায়ের কাপ, কাঁটা, চামচ রাখাই ছিল। আর ছিল একটি সুদৃশ্য ক্রিস্টাল জারে কিছু নোনতা ক্রাকার। চায়ের কাপে টি-ব্যাগ দিয়ে ফুটন্ত জল দিয়ে চটপট চা তৈরী। বাড়িতে সেন্ট্রাল হিটিং থাকার দরুন সব ক'টি ঘরই মচমচে গরম হয়ে আছে। টেবিলের নিচে Pixle দিব্যি গোল হয়ে আবার নিদ্রামগ্ন। আমরা স্যান্ডউইচ আর চা খেতে খেতে এদিক ওদিকের ছোট ছোট কথা বলে চলেছি এমন সময় জেনির সেল ফোন বেজে উঠল। নম্বর দেখে জেনির মুখভরা হাসি। বলল - আমার মেয়ে ম্যারিয়ানা। কথা শেষ করে এসে বলল - আমি ওকে 'অ্যানা' বলে ডাকি। জানো, অ্যানাকে দত্তক নেবার সময় আমরা জানতে পারি ওর মা ব্রিটিশ ও বাবা ভারতীয়। অ্যানার চুল আমারই মত লাল! আমাদের ছেলেটির বাবা মা দু'জনেই ভারতীয়। আমাদের কোনোও তেমন চাহিদা না থাকাতেও কি আশ্চর্য যোগাযোগ! ওকে দেখে অনেকেই বলেছে বিজুর সঙ্গে ওর ভারি মিল। এখন অ্যানা খুবই লক্ষ্মী মেয়ে কিন্তু একসময় ও আমাদের খুবই দুর্ভাবনায় ফেলেছিল। পড়াশোনা করতো না, স্কুল ছেড়ে লন্ডনে গিয়ে waitress এর কাজ নিয়েছিল। বিজু এখানে এত নামকরা ডাক্তার আর তার মেয়ে Waitress!!! বড় আঘাত পেয়েছিল বিজু আর তার সে দুঃখ আমাদের কম আহত করেনি। আমি নিজেকে দোষ দিয়েছি বার বার কেন আমি দত্তক নেওয়ার জন্য এত জেদ করেছিলাম সে কথা ভেবে। জেনির চোখে উদগত অশ্রুকণা চিকমিক করে ওঠে। বলি, - তুমি বড় নরম মনের মেয়ে, এত কষ্ট কি তোমারই ভাগ্যে ছিল? জেনি বলে, - তোমাকে বলেছিলাম না যে আমাকে সব কিছু পেতেই ভারি মূল্য দিতে হয়। কথাটা সত্যি। আর একটু শুনলেই বুঝতে পারবে - তবে তোমাকে বোধহয় আমি বিরক্ত বা উদ্ব্যাস্ত করে তুলছি আমরা পুরোনো কথা শোনাতে শোনাতে, তাই না? ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিই, - একটুও না, একটুও না। তুমি যে আমাকে আপন ভেবে তোমার মনের কথা বলতে পারছো সেই ভেবেই আমি কৃতজ্ঞ, বলো তুমি, আমি শুনছি।

জানলার বাইরে অন্ধকার যেন একটু হাল্কা, বোধহয় রাস্তার আলো এসে পড়েছে পিছনের লনে। একটা রাত পাখী প্রকৃতির মৌনতাকে ভেঙ্গে টুটুক-টুটুক আওয়াজ করতে করতে

উড়ে গেল। জেনি বাইরের দিকে চোখ রেখে বলতে শুরু করল তার কাহিনী। ড্যানিয়েলকে প্রথম প্রথম আমি মিঃ স্মিথ বলেই সম্বোধন করতাম, সেটা ওর একেবারেই পছন্দ ছিল না। আমাকে বলতো তুমি এত ফর্মাল কেন? তারপর কাছাকাছি কাজ করতে করতে ড্যানিয়েলও পরে ড্যান হয়ে গেছে। তার ভদ্র, সংযত ব্যবহার, শোভন আচরণ, একেবারে যাকে বলে perfect gentleman।

শুনেছি লন্ডনে ওকালতির কাজ থেকে অবসর নিয়ে সমুদ্রের কাছে একটি ছোট বাড়ি করেছিলেন নিজের আর স্ত্রীর জন্য, ইচ্ছে ছিল শেষ জীবনটা দেশ বাড়িয়ে আর চার্চের কাজ করে কাটিয়ে দেবেন দু'জনে। কিন্তু বিধি বাম। অবসর নেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই ধরা পড়লো স্ত্রীর হার্টের অসুখ। বিজুর চিকিৎসায় বেশ ভালোই ছিলেন কিছুদিন, তবে সার্জারীর ফল ভালো হয়নি। অপরেশনের পর আর বিছানা ছাড়তে পারেন নি। প্রায় বছরখানেক 'কোমা'য় থাকার পর এক তুষারের প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে ড্যানকে একেবারে একা করে দিয়ে চলে যান। ড্যান তার নিজের একাকীত্ব দিয়ে আমার একাকীত্বের যন্ত্রণা বুঝতো পারতো। নিজের কথা বেশি বলতো না কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম তার বুকের মধ্যে অহরহ এক রক্তক্ষরন হয়ে চলেছে। আমার কাহিনী সে শুনতো চুপ করে। আমি অনুভব করতাম যেন আমাদের দু'জনের দুঃখিত প্রাণ দু'টি নদীর জলধারার মতো একসঙ্গে মিশে বয়ে চলেছে কোন শান্তির মহাসমুদ্রের উদ্দেশ্যে। এই শুদ্ধ শান্ত মানুষটি দিনে দিনে আমাকে এক অদ্ভুত আকর্ষণে সম্মোহিত করেছে, আর আমার অন্তর সেই ডাকে সাড়া দিতে চেয়েছে।

জেনির কথা থেকে আমি উপলব্ধি করতে পারি, দু'জন মনের দিক থেকে নিঃস্ব মানুষ তাদের সুখদুঃখের আদান প্রদান করতে করতে কখন বাইরের জগতের সব বোঝাপড়ার বাইরে, অন্তরের গভীরে কাছাকাছি এসেছে তা তারাও বুঝতে পারেনি। তাদের অর্ধমৃত জীবন আবার বিশ্বের প্রাঙ্গনে নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছে, বাঁচতে চেয়েছে।

জেনি আনমনে বলে চলেছে - কিছুদিন আমি এই আকর্ষণের কথা নিয়ে অনেক ভেবেছি, নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি কিন্তু মনকে বশ করতে পারিনি। একদিন কাজের শেষে যখন সবাই চলে গেছে তখন ড্যান হঠাৎই বলে উঠলো, জেনি, জীবন তো একটাই, জীবনে বাঁচতে চাওয়াটা কি এতই অপরাধের? আমি অবাক চোখে ফিরে দিকে তাকাতে ড্যান বলল, যা সত্য তাকে অস্বীকার করলে সে যদি হারিয়ে যায় তাকে আর কি ফিরে পাওয়া যাবে? আমার চোখের দ্বিধাভরা ভয়ের ছায়া সে দেখতে পেয়েছিল কিন্তু তার মনের বিশ্বাসে সে দৃঢ় ছিল। বলল, ভেবে দেখো।

আমার মনের দ্বন্দ্ব তখনও যায়নি। যখন মনের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে প্রায় ক্লান্ত তখন এক নিদ্রাহীন রাতের শেষে যখন প্রথম ভোরের আলো দেখা দিয়েছে তখন আমার বিজুর শেষ কথাটি মনে পড়ে গেল - "আমি চাই আমি চলে যাবার পরেও যেন তুমি জীবনে একা না হয়ে যাও।" আমার মনে বহুদিনের পরে যেন শান্তির বৃষ্টিধারা ঝরে পড়তে লাগলো আর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম পরম স্বস্তিতে।

কয়েক মাস কেটে গেল। ড্যান আর আমি স্থির করলাম আমরা চার্চের বিধিমতো বিবাহের পবিত্র বন্ধনেই নতুন করে জীবনের পথে চলা শুরু করবো। সেই মতই আয়োজন চলতে লাগলো। হয় ড্যান আসে আমার বাড়িতে কিংবা আমি যাই তার কটেজে। বন্ধু-বান্ধবরাও সঙ্গ দেয় মাঝে মাঝে। এর মধ্যে একদিন ড্যানের আসার কথা, কিন্তু সময় পেরিয়ে গেলেও, সে এলোনা। ভাবলাম হয়তো ট্রাফিকের গোলমাল। আরো কিছু সময় গেল। ফোনেও যোগাযোগ করতে পারছি না। আমার মনে দুর্ভাবনার ঝড়। কিন্তু তখনোও জানিনা শুধু ঝড় নয়, এক প্রবল ঘুর্নিবাত্যা আমাকে গ্রাস করতে আসছে। আমি গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম ড্যানের বাড়ির রাস্তায়। মনে কেবলই আশা, দেখতো পাবো ড্যানের নীল রং গাড়ী, অপ্রস্তুত হেসে ড্যান দেরী হওয়ার কৈফিয়ত দেবে! না, তেমন কিছুই হ'ল না, একঘন্টা পর আমি পৌঁছলাম তার বাড়ির দরজায়। চারিদিক নিস্তব্ধ। ড্যানের গাড়ী ড্রাইভ-ওয়েতে দাঁড়ানো।

সেই সময় আমার প্রচন্ড উদ্বেগের কোনোও উদাহরণ আমি ভাষায় দিতে পারবো না। দরজায় বেল, আমার সেল ফোন থেকে ফোন, কোনো কিছুই কাজ করছে না। শেষে পুলিশ কে ফোন করলাম। তারা এসে দেখলো নিষ্প্রাণ ড্যান - এই বলে জেনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, মাটিতে বসে পড়লো। কান্নার শব্দে দেওয়াল কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো, বাইরে শীত শিহরিত পৃথিবী আর ঘরের মধ্যে নিঃস্তব্ধ আমি এই অপরিসীম দুঃখের তুষারপাতের সাক্ষী হয়ে রইলাম।

আমি বুঝেছি কেন জেনি বলেছিল, কোনও কিছু পেতে হলে তাকে ভারি দাম দিতে হয়।

কবির ভাষায় বুঝি বলা যায় -

'যতবার আলো জ্বালাতে চাই নিভে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।'

(লেখিকা আমেরিকা প্রবাসী এক বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'বসু পত্রিকা'য় নিয়মিত লেখেন।
'তুলি কলম'-এর পক্ষ থেকে ওনাকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

মা কামাখ্যার দর্পণে কমলা
গল্প হলেও সত্যি!

আলপনা চৌধুরী সিন্‌হা

কমলার বয়স তখন পাঁচ বছর। কমলার দিদিমা এসেছেন গৌহাটি বেড়াতে। একদিন সকালে কমলা শুনতে পাচ্ছে ওর মা বাবাকে ডেকে বলছেন, 'ওগো শুনছো, ভাবছি আজ মাকে নিয়ে মা কামাখ্যার মন্দিরে যাবো, পুজো দিতে। সঙ্গে সুধীরকেও নিয়ে যাবো।' সুধীর হল কমলার দাদা। বাবা বল্লেন, 'ভালো কথা, আমি ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি তোমাদের পাহাড়ের নীচ পর্যন্ত নিয়ে যেতে।' কমলা যেই মা-বাবার কথা শুনতে পেলো, সে মাকে বলতে শুরু করলো, 'মা, আমি তোমাদের সঙ্গে কামাখ্যা মন্দিরে যাবো।' মা বল্লেন, 'তুমি এত ওপরে উঠতে পারবে না কমলা।' মন্দির পাহাড়ের একেবারে চূড়োয়। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে কামাখ্যা মন্দিরে ওপরে দর্শন করতে যেতে হতো। কমলা ততই কেঁদে কেঁদে বলতে থাকলো, 'আমি পারবো, আমি পারবো।' কমলার কান্না দেখে মার কষ্ট হলো, তিনি নরম হয়ে বল্লেন, 'আর কেঁদোনা, তাড়াতাড়ি চান করে তৈরী হয়ে নাও, আমরা তোমাকে নিয়ে যাবো।' কমলার তখন কি আনন্দ দেখে কে?

পাহাড়ের নীচে গাড়ী থেকে নেমে কমলার কি আনন্দ। দাদার হাত ধরে নেচে নেচে, এবড়ো খেবড়ে, ছোট বড় পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠতে লাগলো। দুধারে বড় বড় গাছ আর নীচে খরস্রোতা ব্রহ্মপুত্র নদী।

মন্দিরের কাছে এসে কমলা দেখলো, দুধারে কত দোকান, নানা ধরণের খেলনার, কাঠের পুতুলের দোকান। কাঠের পুতুল দেখে কমলা তার মার কাছে বায়না করায়, মা বল্লেন, 'পুজো হয়ে যাবার পর, বাড়ী ফেরার পথে তোমাকে পুতুল কিনে দেবো।' কমলা মন্দিরের ভেতরে গিয়ে মা কামাখ্যাকে প্রণাম করে। পুজোর পর মা কমলাকে একটা কাঠের পুতুল আর একটা কমলালেবু কিনে দিলেন। কমলার কি আনন্দ। সে সবার সঙ্গে লাফাতে লাফাতে গুণ গুণ করে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ের নীচে নামতে লাগলো। কমলার একহাতে পুতুল অন্য হাতে কমলালেবু। হঠাৎ বনের মধ্যে থেকে একটা বাঁদর এসে, কমলার হাত থেকে লেবু থাবা দিয়ে নিয়ে যেতেই কমলা ভয়ে চিৎকার করতে করতে মাদের কাছে না গিয়ে, নীচের দিকে দৌড়াতে থাকলো।

তারপর ব্যালান্স রাখতে না পেরে পাহাড়ের অনেক নীচে পড়ে গেলো। সেই দেখে মা, দাদা, দিদিমা চিৎকার করতে শুরু করলেন। মাদের পিছনেই কয়েকজন বিহারী যাত্রী পুজো দিয়ে ফিরছিলেন। তারা চিৎকার করে বলতে থাকলেন, 'লড়কী মর গেয়া।' বলে সবাই পাহাড়ের নীচের দিকে দৌড়াতে থাকলেন, কমলাকে খোঁজার জন্য। তারা গিয়ে দেখলেন কমলা দুটি ডালের মধ্যে আটকিয়ে আছে, আর তার ঠিক নীচ দিয়েই ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোত দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে।

কমলাকে তুলে এনে বিহারী যাত্রীরা দাদার কোলে দিয়ে, মাকে বল্লেন, 'মাতা দেবী কামাখ্যা আপকো বেটিকো বাঁচায়া।'

মা কামাখ্যার আশীর্বাদেই কমলা এখনো বেঁচে আছে। মা দয়াময়ী কামাখ্যা, আপনার পদতলে কোটি কোটি প্রণামান্তে আপনার মেয়ে কমলা।

GHOST LOVER'S TALES

Mita Mukherjee

Since I was young I have been fascinated with ghost stories. I think my interest was nurtured by my uncle (my choto mama), who had the most fascinating way of relating ghost stories.

This was one of the tales told by my mama, which I am relating in his own words.

It was winter, I was the chief engineer at that time and had been assigned to a project that required a lot of travelling; this event happened around the year 1950, back home in India. I had finished the job I had come for and was looking forward to a nice train ride home to Calcutta, when my boss called me;

He said it was imperative that I travel that night to a neighborhood town, about 70 miles away, and I was supposed to stay the night there and inspect a dam that was being constructed, in the morning. After much humming and hawing I agreed. I figured it was worth getting it over with, rather than having to come back two days later.

So with much reluctance I summoned the chowkidar (security guard) to call me a taxi or rented car or some sort of conveyance; "Abhi to taxi milna mushkil hay, dekhta hu kya milega" translated into "it will be very hard to find a taxi at this time of the evening, but let me see what I can find."

After half an hour he came back with a ramshackle car and a very young man at the wheel, he seemed not more than sixteen, "tomhara license hay to?" "Do you have a license?" I asked.

The young man grinned and nodded his head, at least he was pleasant; but full of foreboding I got into the car, praying that the car wouldn't break down half the way.

The car took off at break neck speed, I explained to the young man whose name incidentally was, "Ram" that I needed to go to the Government bungalow that had been booked for me, and pleading with him to slow down, a little, I sat back trying to relax.

Ram said not a word, but did slow down a tad, and what with the bumpy roads and my exhaustion, I must have nodded off a little;

Suddenly my eyes flew open, an unnaturally cold air had permeated the inside of the car, and it was pitch dark outside, I thought Ram must have opened one of the windows of the car, instantly I yelled, "Ram—ye thanda hawa kahan se a raha? Khirki khola kiyun?" (Ram why is there cold air in the car, why did you open the window?"

"Babu pass me kabarsthan hay—isi liye itna thanda" (translated, Babu we are driving by the graveyard that is why it is so cold).

The voice that answered me was guttural, not of a young man at all, looking towards Ram I could see that his hair was totally grey, this was not the young man that had been driving me before—this looked like an old wrinkle faced man, as I could make out from the rear view mirror! --I couldn't believe my eyes! It was pretty dark, but how could I be so utterly mistaken. When did the drivers get switched? I must have napped for about half an hour, but I did not feel the car stop—

"Ram Ram kahan hay? gari ruko! Aap kon ho?" I cried, hysteria creeping into my voice.(translated, Ram Ram where is Ram? Who are you?)

The car kept flying as if on air, I couldn't even feel the road bumps anymore, I felt as if I was going insane, the cold air swirled around my head causing me to shiver uncontrollably, I was petrified, I couldn't make out whether I was dreaming or awake;

I closed my eyes and started chanting, "om nama Shivaya—help me help me Shiva my ishta devata, help me—help me"(Lord Shiva—help me)

Suddenly the car stopped, I didn't dare open my eyes;

A human voice said, "Babu Bangalow is here, do you want to get out? I will take your luggage—will you like to have dinner?"

I cautiously opened my eyes, there was a chowkidar, dressed in a uniform waiting on me, I looked towards the driver, but there was no one in the driver's seat; however the young man, Ram was standing off to the side;

I wanted to ask him what had happened while we were driving by the graveyard, how had he transformed into an old grey haired man with a guttural voice. I stepped out of the car, reaching into my wallet to give him some tips, I beckoned to him, he nodded, grinned again, refused the tips, got into the car and drove off grinning and waving---

The chowkidar said, "Babu o to gunga hay, he can't speak!'

I recounted my experience to the chowkidar, he nodded sagely and said, "Babu aap shayed sapna dekha hoga" (babu you must have been dreaming)

I knew I wasn't dreaming—it must have been a ghostly encounter!

TALE #2

The story was recounted by my cousin Ratnadi, in her own words, here it is;

I was about sixteen at that time, it was my older brother's wedding night or rather the night of the "full-sajya" as all of you Bengalis know it is the first night after the wedding that the bride and groom spend the night together, and we decorate their bed with flowers and garlands etc.

We lived in the mansion built by one of my ancestors.

The house was built by W.C. Bonnerjee, the first president of the congress. It used to be a very grand old house; the floors were made of marble, Chandeliers used to hang from the ceilings. A double staircase led up to the second floors. Years of neglect now gave it a dilapidated air.

There were numerous rooms, but most were unused. The house had been divided up between relatives, and some had locked the rooms and left causing dust and bugs to reside happily in the interiors.

We had inherited a corner of this huge house, three cozy rooms a kitchen and dining area was our home. As you know, a wedding is a huge affair and numerous relatives congregate to have fun, as the evening drew to a close, the festivities were almost over. My room which was the most spacious had been delegated to the bride and bridegroom, my parents room was bulging with all the aunts and their children, the other big room had been prepared for the men in the family, it was pretty traditional that people just made the best of it and slept on make shift beds;

Me and my cousin who had come to visit us from America had no place to sleep; Being sixteen I had acted as a gofer, a constant running back and forth, "get this, get that, can you find this, where is that?" I was exhausted, and was looking forward to a nice night of undisturbed sleep—but where?

Finally I asked my mother what to do, but she looked harried and flustered. So I decided to open up the little room at the far corner of the house; one had to go around the long veranda to the opposite end to get to it; It was used as a study room, by my brother who was in medical school. I thought this would do for one night.

As I unlocked the door, a musty smell greeted us, I had taken a bundle of mats, sheets, cleaning rags, and my cousin followed with some pillows; I turned on the light, a skeleton hanging from a stand rattled, grinning at us—my cousin shrieked and dropped the pillows;

I laughed, "Oh that is Sri Gobordhan, the skeleton, don't worry we play with him all the time, come let us clean up the place we have to sleep here.

"You got to be kidding me! I ain't sleeping here—no way man!" My cousin exploded.

"Okay then find your own spot—you want to sleep in the middle of all those aunties—fine, at least I will sleep comfortably here, now you want to help me or not?" I said getting irritated.

She sulked and then thought the better of it and helped me, in making a bed on the floor; we changed, and before turning off the lights, I closed and barred the heavy wooden door.

"We are way over at the other end of the house, are you sure nobody can come through the door? I am afraid of burglars" my cousin said;

"Feel this wooden bar, it is so heavy no body can come through, not to worry" I said consolingly and turned off the lights crept into the makeshift bed and felt my eyes closing;

I heard her mumbling something about the skeleton—"Go to sleep!" I cried in a harsh whisper. "Okay" she said, a bit irritated, but thankfully fell asleep. I could hear her steady breathing, "Thank God, now I can get my much needed shuteye" I thought and instantly fell asleep.

It must have been about three in the morning, a faint noise woke me up; "chum chum gap chum—chum" as if some lady with a payel (a silver anklet with bells) was coming towards us, my first thought was I must have been dreaming; A faint light was coming through the wooden slats in the windows, I looked around, my cousin was peacefully sleeping, she had taken over half of the bed, I shifted my position and attempted to go back to sleep; Suddenly the skeleton started rattling, as if somebody was shaking it!

My cousin jumped, "What was that?" she screeched in a loud whisper.

"Nothing, just Sri gobordhan, rattling—he does that sometimes, go to sleep!" I said in a brave whisper. "But why was he rattling? There are no wind gusts or fans in the room?"

"I don't know" I whispered back.

The rattling stopped I went back to sleep, I was so exhausted!

I woke up around six the next morning; my cousin was sleeping deeply, snoring in fact;

Sunlight was streaming in through the open door, I sat up; I didn't remember opening that door! And my cousin, she was thin as rail, not as strong as me, there was no way she could have opened it by herself—then who opened the door?

I pondered, getting mystified; as I stood up, a heavy gold chain that had been wrapped around my neck quite tightly, fell to the floor!

"What the?" I gasped in surprise; I remembered thinking to myself that the chain was a bit uncomfortable and tight around my neck, and I had attempted to take it off but the clasp on it was tight and I was too tired to mess with it last night---so who took off my chain? Must have been my cousin—but why would she get up in the middle of the night and take my chain off? It made no sense;

Then faintly I remembered the rattling of the skeleton, the "chum chum beat of the payel, a faint feeling of someone touching my neck, and I, trying to brush an unseen hand away—chills ran down my spine—it must have been the ghostly presence of Madira, a courtesan who, history has it that she had committed suicide in this very room!

I jumped up and woke my cousin up, "let's get out of this room" I cried

My cousin said sleepily, "Why?"

"Because----There is a---." I stopped my self, who would believe my ghost story—they would laugh at me;

I looked at Gobordhon, the skeleton, and said, "You know what I am talking about right?"

His grin seemed to get wider as he rattled his answer.

I hope you all have enjoyed my stories, I will have to tell you the story of Madira some other time.

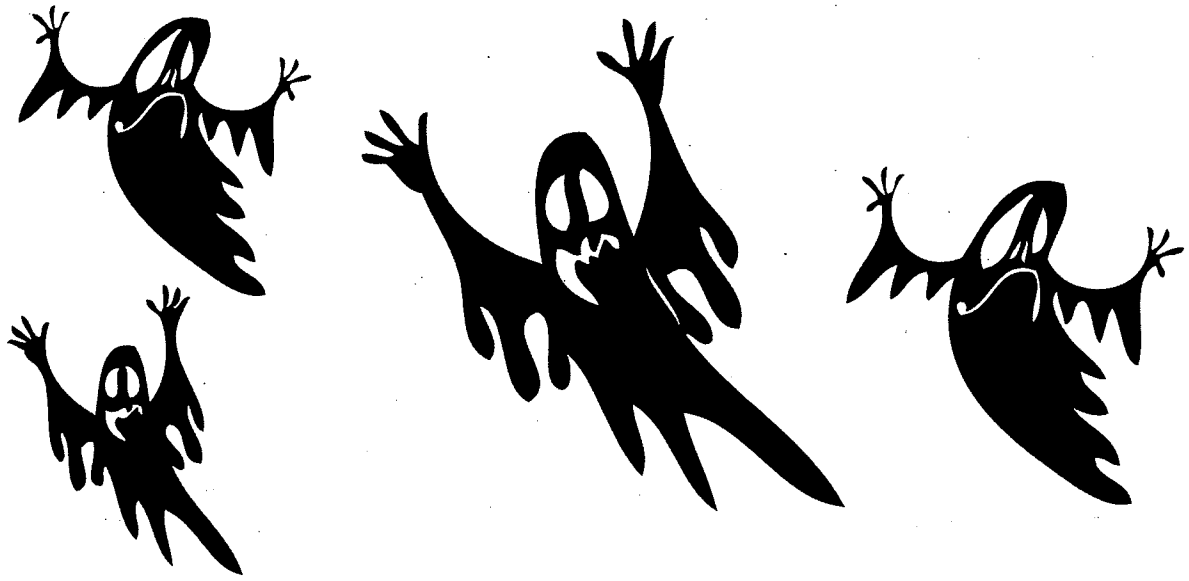

যাত্রা

বাসুদেব আচার্য

।।এক।।

বেশ কয়েক মাইল হেঁটে পূর্ব বিহারের এক প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছল উত্তীয়। তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে পার্টির কৃষক-কমরেড সুদামা। বাংলা থেকে বিহার আসার সময় উচ্চতর নেতৃত্ব বলে দিয়েছে সে যেন কোনওভাবেই স্টেশন চত্বর থেকে সিগারেট বা বিড়ি না কেনে, চা না খায়। গলা শুকিয়ে কাঠ। জলের বোতলটাও শেষ হওয়ার মুখে।

মূল শহর থেকে গ্রাম অনেক দূর। সকাল থেকে হাঁটা শুরু হয়েছে, এখন সূর্য অল্প ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। তীব্র দহনে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী। রাস্তায় একটা কুকুরও নেই। উত্তীয়র গায়ের জামা ঘামে লেপটে আছে, গাল আর থুঁতনি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে নোনতা তরল। জ্যৈষ্ঠের রোদে ঝিমঝিম করছে মাথা। সুদামা অবশ্য এসবে বেশ অভ্যস্ত। কোনও একটা ভোজপুরি ছবির গান গুনগুন করতে করতে চলেছে।

উত্তীয় আর পারছিল না। পায়ে চটি থাকা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে তপ্ত চাটুর ওপর হাঁটছে। একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ও ডাকল সুদামাকে, "কমরেড, ঔর কিতনি দূর যানা পড়েগা?"

"বাস পহুঁচ গয়ে....আট-নও মীল কে কুছ আস-পাস...." সুদামার নির্বিকার উত্তর।

গাছের নিচে বসে পড়ল উত্তীয়। এখনও আট মাইল। ওরা প্রায় বিশ মাইল হেঁটে এসেছে এক নাগাড়ে। এরপরে আরও .... উফ।

গাছের ছায়া লম্বা হতে হতে মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে। দুপুরের লু থেমে ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। বাবলার ঝোপগুলোকে দেখতে লাগছে হাত-পা ছড়ানো অশরীরীর মত।

সন্ধ্যে সাড়ে-সাতটা নাগাদ উত্তরীয়রা পৌঁছল নির্দিষ্ট গ্রামে - দরিদ্র কিষানদের বসতি, প্রায় অধিকাংশই হরিজন। পাশ দিয়ে তির তির করে বয়ে চলেছে এক চিলতে নদী। মিশকালো অন্ধকারের মধ্যেও উত্তীয় ঠাহর করতে পারল যে এই অঞ্চল এখনও একশো বছর আগের অবস্থা পড়ে আছে। বিংশ শতকের শেষ ধাপে পৌঁছেও এমন গ্রাম রয়েছে ভারতবর্ষের বুকে। টিমটিমে কুপির পাশে হাড় বার করা বৃদ্ধ, শিশুর কান্নার আওয়াজ, সব মিলে অদ্ভুত মন খারাপ করা পরিবেশ।

একটা ছোট ঝুপড়ির সামনে একে দাঁড়াল দুজন। মাটিতে চাটাই পেতে কয়েকজন বসে কথাবার্তা বলছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে এলো। উত্তীয়কে উদ্দেশ্য করে বলল, "কমরেড, আনে মে কোই তকলীফ তো নহী হুই? জলদী মুঁহ-হাত সাফ কর লীজিয়ে। চায়ে তো পীয়েঙ্গে?"

ততক্ষণে সুদামা হাতে করে একটা মাটির পাত্রে জল নিয়ে এসেছে। মুখ-হাত ধুতে ধুতে উত্তীয় ভাবল, এই গ্রামেও লোকে চা খায়। ঘরগুলোর অবস্থা তো চোখে দেখা যায় না। চায়ের পয়সা পায় কোথায়?

চাটাইয়ে বসতে বসতে মধ্যবয়সী লোকটা উত্তীয়র হাতে একটা গামছা দিল - "ইসকি জরুরত পড়েগী আপকো।" তারপর একটু হেসে নিজের পরিচয় দিল, "মেরা নাম হ্যায় বংশীলাল। পিছলে আঠঠারা সাল সে ইসি গাঁও মে হুঁ।" বাকিদের সাথে একে একে পরিচয় করিয়ে দিল বংশীলাল। মাও-চিন্তা প্রচার টিমের কয়েকজন কর্মীর সাথেও আলাপ হল।

একটা অল্পবয়সী মেয়ে কানভাঙা টিনের কাপে "চা" এনে দিল।

বংশীলাল বলল, "মাফ করনা কমরেড, শক্কর নহী হ্যায়, ইসলিয়ে আজ নমক সে হী কাম চলানা পড়েগা।"

চায়ের সাথে একটা বিড়িও মিলল। নাহ, বিড়ি ঠিক নয়, একে বলে চুট্টা। কয়েক টানের বেশি দেওয়া যায় না। বুক জ্বলে যায়।

একটু হেসে বিড়ি জ্বালিয়ে উত্তীয় চায়ে চুমুক দিল। এটা চা। ভাত রান্নার ফ্যানের সাথে একটু নুন মিশিয়ে দিলে যা হয়, এও তাই। চুপচাপ খেয়ে নিল উত্তীয়। সে তো আর চা খেতে আসেনি, সংগঠনের কাজে এসেছে। লোকাল কলেজের কিছু ছেলে-মেয়ে আসবে তার সাথে দেখা করতে আর কয়েকদিনের মধ্যেই। ছাত্র-সংগ্রাম কমিটির অভিজ্ঞতা বিনিময় করাই উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সংগ্রামী রেডগার্ডের হিন্দি পাবলিকেশন ইউনিটও বানাতে হবে। মাস দুয়েকের ভিতর সব শেষ করে ফিরে যেতে হবে বাংলায়।

বংশীলাল এবং অন্যান্যদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর খাওয়ার ডাক পড়ল। মকাই দানার ভাত, শাক-জাতীয় কিছু একটার টক টক তরকারি আর নুন। ক্ষিদের মুখে এই খাওয়াই অমৃত মনে হল।

পরিশ্রমে ক্লান্ত উত্তীয় শুয়ে পড়ল খেয়ে উঠে। পা দুটো যেন কেউ কেটে নিয়েছে - কোনও সাড় নেই। খুব বেশি হলে সাড়ে-ন'টা বাজে। এরই মধ্যে গোটা গ্রামটায় মধ্যরাতের আমেজ। ঝুপড়ির দরজার কাছে একটা চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে তাকাল উত্তীয়। আগের দিন অমাবস্যা কাটিয়ে আজ উঁকি দিয়েছে এক ফালি চাঁদ।

।।দুই।।

মহাবোধি সোসাইটির সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে প্রজ্ঞা। ঘন ঘন চোখ চলে যাচ্ছে হাত-ঘড়ির দিকে। কখন যে আসবে লোকটা। এদেশে বিপ্লবটা হবে কী করে? যারা লড়াইয়ের ঠেকা নিয়েছে তাদের কোনও সময়জ্ঞানই নেই। সুরজিৎ-কে ডাকবে একবার? নাহ, লাভ নেই। নির্ঘাৎ ক্যান্টিনে বসে ফিলজফির ওই নতুন মেয়েটার সাথে বকর-বকর করছে। পারেও বটে। ও কী যেন একটা ইয়ার্কি মেরে বলত সুরজিৎ সম্পকে? হ্যাঁ, মনে পড়েছে - "he runs after every petticoat."

এইসব ভাবতে ভাবতে প্রজ্ঞা দেখল সামনে অনীকদা এসে দাঁড়িয়েছে।

"কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছ?" রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করল অনীক।

প্রজ্ঞা দেখল দুপুরের রোদে অনীকের ফর্সা রঙটা কেমন তামাটে হয়ে গেছে।

অনীক আবার প্রশ্ন করল, "কি গো, কতক্ষণ?"

"এই তো, মিনিট তিরিশ...." প্রজ্ঞা উত্তর দিল।

"হুম....সরি। আসলে ট্রেনটা লেট করল...."

"না না, ইটস ওকে...."

একটু থেমে অনীকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রজ্ঞা বলল, "অনীক-দা, ও কোথায় আছে জানেন? মানে, প্রায় দিন দশেক হয়ে গেল কোনও যোগাযোগ করছে না। খুব চিন্তা হচ্ছে।"

অনীক কোনও উত্তর না দিয়ে চারপাশটা একবার দেখে নিল। তারপর বলল, "এখানে দাঁড়ানো ঠিক হবে? অন্য কোথাও গিয়ে বসলে হয় না?"

"কফি হাউস যাবেন?" প্রজ্ঞা জিজ্ঞেস করল।

"না না, কফি হাউসে না.... মানে, ওখানেও তো.... তোমার ক্যাম্পাসের ভেতরে গেলে হয় না? অনীক গলা নামিয়ে প্রশ্ন করল।

"ক্যাম্পাসে?" একটু যেন দ্বিধা নিয়ে বলে উঠল প্রজ্ঞা।

অনীক একটা বিড়ি বার করে দাঁতে কামড়ে বলল, "তাহলে বরং কলেজ স্কোয়্যারের ভেতরে YMCA 'র দিকে চল," বলেই হাঁটা লাগল।

YMCA'র সামনে পৌঁছে অনীক বলল, "দেখো, আমি সত্যিই জানিনা ও কোথায়। পার্টি কি ডিসিশান নিয়েছে সেটা সবসময় জানা সম্ভব হয় না।"

প্রজ্ঞা বিরক্ত হল এবার। একটু কড়া গলায় বলল, "সে ঠিক আছে, কিন্তু দিন দশেক কোনও খবর নেই...."

"হুমমম...." অনীক চুপ করে গেল।

"অনীক-দা, একটা কথা বলবেন? ও কি ঠিক আছে?"

অনীক প্রজ্ঞার দিকে তাকাল। চশমার ওপার থেকে প্রজ্ঞা অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে। ঠাণ্ডা দৃষ্টি। মুখে একটা হাসির রেখা টেনে অনীক বলল, "বেঠিক তো কিছু শুনিনি। তুমি অকারণ টেন্স হয়ো না। ও ঠিকই আছে। তবে এর চেয়ে বেশি কিছু আমি জানি না। খবর নেবার চেষ্টা করব। যাইহোক, এখন চলি। একটু কাজ আছে। ভাল থেকো।"

"আপনিও," বলে প্রজ্ঞা আলতো হাসল।

।।তিন।।

গত একমাস ধরে উত্তীয় এই গ্রামে আছে। দেখেছে, যা ও কখনও দেখেনি, শোনেওনি। যারা শুধু গালভারি পত্রিকায় বিভিন্ন পরিসংখ্যান ঘেঁটে কৃষি উৎপাদনে পুঁজিবাদ এল কি এল না, বা ভারত রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের স্বরূপ ইত্যাদি নিয়ে চুলচেরা গবেষণা করে, তাদের প্রতি একটা অদ্ভুত ঘৃণা জেগে উঠছিল ওর মনে। Extortion আর Exploitation, এই শব্দ দুটোর আসল মানে বোঝা যায় না এখানকার গ্রাম না দেখলে। জোতদার লখন সিং আর তার ভাই শেওপূজন সিংয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে কোনও ক্ষেত-মজুর পরিষ্কার ধুতি পরে যাবে, অ্যাইসি মজাল। হরিজনের বাচ্চা চিরকলা হরিজন থাকবে, সে সাদা ধুতি পরবে কেন? শুধু ধুতি পরাই নয়, জোতদারদের সামনে মাথা উঁচিয়ে সোজাভাবে হাঁটাও নাকি বেআইনি। চড়, থাপ্পড়, জুতোর বাড়ি খেয়েও দরিদ্র কৃষক মাথা নীচু করে থাকে, "আহ" শব্দটুকু করে না - হাজার হোক উঁচু জাত। কাস্ট স্ট্রাগল-ইক্লাস স্ট্রাগলের রূপ নিয়েছে। "জোতদার মেরেছে" - এমনটা এখানে কেউ বলে না। "রাজপুত মেরেছে" বললেই বোঝানো হয়ে যায় কে মারতে পারে। '৪৭-এর পর নাকি জমিদারদের ধনে প্রাণে মেরে দেওয়া হয়েছে। কৃষককে আর বেগার খাটতে হয় না। বন্ডেড লেবারও নাকি উঠে গেছে। কিন্তু আসল চিত্রটা কলেজ-ইউনিভার্সিটির পাঠ্য-পুস্তক থেকে ঢের আলাদা। হ্যাঁ, বেগার নেই, কিন্তু বনিহার আছে, যা আসলে বেগারেরই আধুনিক রূপ, নামটাই যা আলাদা।

যাইহোক, ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে অত্যাচারের মাত্রা এখন খানিকটা হলেও কম। গত বছর শেওপূজনের খাস লেঠেলের একটা হাত টাঙ্গির এক কোপে নামিয়ে দিয়েছিল কৃষকরা। সেই থেকে ওদের মনে ভয় উঁকি মারতে শুরু করেছে।

বংশীলালের কাছ থেকে উত্তীয় এরকম অনেক কথা শুনেছে। লোকটাকে দেখলে কেমন অবাক লাগে ওর। কোথায় গোরখপুরের কোন এক কলেজের অধ্যাপক, শেষে চাকরি ছেড়ে বিহারের এই এঁদো গ্রামে পড়ে আছে আঠেরো বছর ধরে। হয়তো এই লোকগুলো আছে বলেই আজও মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়। হয়তো এই ধরণের মানুষগুলোর জন্যেই এক না একদিন দেশে বিপ্লব হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে সাধারণ জনতার হুকুমত।

ঝুপড়ির সামনের বড় নিমগাছটার তলায় বসে এসব ভাবছিল উত্তীয়। সম্বিৎ ফিরল ধাতুয়ার চিৎকারে। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে, নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

"বহুত গজব হো গইল কামরিট, লাচ্ছি কো ভুতনী নে পকড় লিয়া।" বলেই দৌড় লাগাল ধাতুয়া। উত্তীয় উঠে জানতে চাইল কী হয়েছে। ছুটতে ছুটতে ধাতুয়া জবাব দিল, "ভূতনী নে পকড় লিয়া...."

এখন কোথায় আছে বংশীলাল? ধাতুয়ার মত কৃষক-কমরেডের যদি এই হাল হয়, তাহলে গ্রামের অন্যদের কী হবে? লাচ্ছির কী হয়েছে? এসব ভাবতে ভাবতে মেঠো পথ ধরে দক্ষিণের মাঠের দিকে জোরকদমে হাঁটা লাগাল উত্তীয়।

।।চার।।

শংকরের চা বানানো দেখছিল বাবলু। পুরনো নারকেল তেলের টিন কেটে বানানো ছাঁকনির জাল দিয়ে কাঁচের গ্লাসে লালচে তরল গড়িয়ে পড়ছে। সেই ভোর থেকে শুরু করেছে, এখন শেষ বিকেল। একটু আগে দু-এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি আলতো ভিজে, সোঁদা গন্ধ উঠছে। রাস্তার ঝুলে পড়া-বৈদ্যুতিক তারে জমে থাকা জলের ফোঁটাগুলো ব্যালকনিতে দাঁড়ানো ইস্কুল ছাত্রের মত নীচের দিকে চেয়ে আছে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে তপু সিগারেট খাচ্ছে। বাবলু এগিয়ে গেল। বলল, "কাউন্টারটা দিস।"

তপু জোরে একটা টান দিল সিগারেটে। তারপর সেটা এগিয়ে দিল বাবলুর দিকে। বাবলু সিগারেটটা দিয়ে মৃদু মৃদু টানতে লাগল।

"একবার যাবি নাকি?" একটা হাই তুলে তপু জিজ্ঞেস করল।

বাবলু তাকাল ওর দিকে, "কোথায় যাব?"

"গতকাল রাতে পুলিশ রেইড করেছে। একবার কাকু-কাকিমার সাথে দেখা করলে হয় না? মানে, জাস্ট কার্টসি আর কি...."তপু খানিকটা দ্বিধামিশ্রিত স্বরে বলল।

"তুই কি পাগল? এই মুহূর্তে ওর বাড়িতে ঢোকা কি প্রচণ্ড রিস্কি জানিস? এখন দেখা করতে গেলে কিসের মধ্যে জড়িয়ে যাব সে খেয়াল আছে তোর?" কথাগুলো বলে সিগারেটটা মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে দিল বাবলু। এগিয়ে এসে তপুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "দেখ ভাই, বাবার ব্যবসা অলমোস্ট লাটে উঠেছে। আমার ওপরেই এখন সব আশা-ভরসা। ওর মত বিপ্লব নামক লাক্সারির কোনও সুযোগ নেই আমার।"

তপু কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল; কানে এল শংকরের গলা, "চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এরপর আবার বলবে ফুটিয়ে দিতে। তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও তো।"

।।পাঁচ।।

"এক কাজ করলে পারিস তো," সুরজিৎ গম্ভীর গলায় বলল।

"কী করব?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টি প্রজ্ঞার।

"তোর শাশুড়িকে ফোন কর একটা," বলেই চোখ টিপল সুরজিৎ।

প্রজ্ঞা বিরক্তি-মাখানো গলায় বলল, "দেখ সুরজিৎ, তুই আমার বন্ধু, খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সব ব্যাপারে ইয়ার্কি মারবি। প্রায় এক মাসের ওপর হয়ে গেল ওর কোনও খবর নেই...."

প্রজ্ঞাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সুরজিৎ বলে উঠল, "আরে বাবা সেই জন্যেই তো বলছি ওর বাড়িতে একটা ফোন করতে। নাম্বার জানিস না?"

"জানি," বলে একটু থমকাল প্রজ্ঞা। তারপর বলল, "কিন্তু এতদিন হয়ে গেল আমি এখনও জানিনা ওর বাড়িতে আমার সম্পর্কে...."

সুরজিৎ আবার বাধা দিল, "তুই কোন সেঞ্চুরিতে পড়ে আছিস বলত? একটা খবর নিবি, তার জন্যে ওর বাড়িতে কী ভাববে, কী ভাববে না.... তোকে কিছু বলার নেই। হোপলেস শালা।"

প্রজ্ঞা সুরজিৎ-এর দিকে তাকাল, "করব? বলছিস?"

ঠোঁট থেকে সিগারেটটা নামিয়ে সুরজিৎ চোখ বন্ধ করে বলে উঠল, "আলবাৎ।"

।। ছয় ।।

মাঠে পৌঁছেই এক বীভৎস দৃশ্য। সদ্য পোয়াতি মেয়েটাকে প্রায় গোটা গ্রামের লোক ঘিরে রেখেছে আর অশুভ আত্মা বিতাড়নের জন্যে তাকে ঝ্যাঁটা দিয়ে পেটাচ্ছে এক ওঝা। সিঁদুর-মাখানো বটপাতা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে জোর করে।

"শয়তান কা কীড়া লেকর ঘুম রহী হ্যায় ইয়ে ভূতনী" বলেই পেটে এক লাথি। লাচ্ছির মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

উত্তীয় এগিয়ে গেল ওঝার দিকে। কটমট করে বলল, "ইয়ে হো কেয়া রহা হ্যায়?" এমন অনধিকার প্রবেশে ওঝা বিরক্ত। ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে।

ধাতুয়া দৌড়ে এল, "আরে কামরিট, ঈবহুত বড় ওঝা হ্যায় অপনে পাসওয়ালে গাঁও কে। দেখনা, উ সসুরা ভূতনী কা গাঁড় কা পানী ভী সুখা করকে ছোড়েঙ্গে।"

উত্তেজিত উত্তীয় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎই সামনে দেখলে বংশীলালকে। একটু এগিয়ে বংশীলাল ওঝার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, "অব আপ যা সকতে হ্যাঁয়, ভূত তো উতর গয়া লগ রহা হ্যায়।" বেগতিক বুঝে ওঝা আর কথা বাড়াল না, স্যাঙাৎ-সমেত চলে গেল নিজের গ্রামে। মকাই চাল আর পয়সাও নিল না।

বংশীলাল উত্তীয়কে ডাকল। লাচ্ছিকে একটা মোটা কাঁথার ওপর তুলে দুজনে মিলে বয়ে নিয়ে চলল - ওর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তামাশা শেষ, তাই গ্রামের সবাই চলে গেল যে যার কাজে। ধাতুয়া ছুটল উত্তীয়দের পিছু পিছু।

লাচ্ছিকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে বাইরে এসে বসল উত্তীয়। গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে ফতুয়ার বোতামগুলো আলগা করে নিল। বংশীলাল আর দাঁড়াল না। ধাতুয়াকে দু'চারটে কথা বলে বেরিয়ে গেল ঝোলা কাঁধে। তাকে মুঙ্গের যেতে হবে রাজ্য কমিটির গোপন মিটিং অ্যাটেন্ড করতে। আর ক'মাস পরেই ইলেকশান। সম্ভবত সেই নিয়ে কোনো আলোচনা আছে। জোতদার লখন সিং এখান থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছে হাত-পার্টির হয়ে। পুলিশের ট্রাক আর জীপ ঘোরাঘুরি করছে অহরহ। সাঁঝের বেলায় কাউকে পথ চলতে দেখলেই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অত্যাচার, অনাহার, কুসংস্কার - এত কিছুর নাগপাশে জড়িয়ে আছে মানুষগুলো। আধপেটা লোকগুলোকে দেখলে যন্ত্রণায় বুক ফেটে যায়। আর কত সহ্য করবে এরা? উত্তীয়র মনে গেল দিন কয়েক আগে শোনা ধাতুয়ার একটা গান - "রোয়ী রোয়ী সে কহেলী

সুদামা সে বহুরিয়া
দিনওয়া পাতার ভইলে,
খাইকে সত্তুয়া নেইখে
গোড়ওয়ায় জুতা নেইখে
দিনওয়া পাতার ভইলে ...."

গোটা রাজ্যের অর্থনীতি স্থবির হয়ে আছে গত কয়েক দশক ধরে। মানবসম্পদ থেকে খনিজসম্পদ, সব আছে; কিন্তু তার কোনো ব্যবহারিক দিক নেই। কিছু লোকের অঢেল পয়সা। আবার বেশিরভাগ মানুষের হাতে অ্যালুমিনিয়ামের একটা সাধারণ টুকরোও দেখা যায় না। বর্ণ-সমস্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যখন তখন রণবীর সেনার তাণ্ডব। বর্ণ-বৈষম্য এতটাই মারাত্মক যে ভাবলে বিস্ময়ে পাথর হযে যেতে হয়। শুধু বড়লোক নয়, গরীব ক্ষেত-মজুরের মধ্যেও রয়েছে বর্ণ-সংস্কার। গ্রামের বুড়ো জগদীশের কাছে উত্তীয় গল্প শুনেছে - একবার কৃষকেরা শেওপূজন সিংয়ের জমির সব ধান কেটে নিচ্ছিল। তাই দেখে সে দলবল নিয়ে ছুটে আসে। বিশাল বিশাল বেলগাড়ি চলে আসছিল দুই ভাই। হঠাৎই মাঠের একটা গর্তে চাকা আটকে লখন সিং গাড়ি থেকে পড়ে যায় এবং পাথরে তার মাথা ঢুকে যাওয়ার ফলে অঝোরে রক্ত পড়তে থাকে। যেসব প্রতিরোধী চাষীর হাতে কাস্তে আর বুলুয়া শোভা পাচ্ছিল, তারাই দৌড়ে যায় 'মালিক'-এর কী হয়েছে দেখতে। কিন্তু লখন কাউকে নিজের কাছে ঘেঁষতে দিতে রাজি হয়নি, নীচু জাতের ছোঁয়া লেগে যেতে পারে।

এককালে অবশ্য এই গিঁটগুলো কেটে গিয়েছিল অনেকটাই। এই সব অঞ্চলে মানুষ একটা লোকের নাম জানত - জওহর। দিল্লী'র প্রবাসী বাঙালী। নকশালবাড়ির রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিহারে চলে এসেছিলেন '৭০-এর একদম গোড়াতেই। তখন থেকে দরিদ্র আদিবাসী এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে ইজ্জতবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন। পার্টি ভাগ হওয়ার পর চারু মজুমদার-পন্থী CPI-ML-এর বিহার নেতৃত্বকারী টিমের দায়িত্ব ছিলেন। কিছু কারণে বিতর্ক দেখা দিলে নিজের ফ্যাকশন তৈরি করে ভোজপুর জিলাতে বিশাল কৃষক-আন্দোলন গড়ে তোলেন, লড়াইয়ের ময়দানে শহীদ হন। এক সময় নাকি বিহারে ঢুকতে হলে সমস্ত ML-গোষ্ঠীকে বলতে হত, "আমরা জওহরের পার্টি থেকে আসছি।" জওহর ভুল করেছিলেন অনেক, তাত্ত্বিক প্রশ্নে বেশ দুর্বলও ছিলেন। কিন্তু তার লড়াইগুলো? স্যাক্রিফাইসটা? উত্তীয়র ভাবলে দুঃখ হয় যে এই লোকটার হাতে

গড়া পার্টিটা আজ সংশোধনবাদের পাঁকে ডুব দিয়েছে। মুখে জওহরের নাম নিয়ে অ্যাসেম্বলিতে সীট জিতে ফুটানি মারছে।

উত্তীয়দের ক্ষমতাও ক্রমশ কমে আসছে। এত দিন প্রায় পঁচিশটা সশস্ত্র স্কোয়াড ছিল। প্রায় দেড়শ উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু '৮২-র ধাক্কা আর '৮৬-এর ভাঙন সংগঠনকে দুর্বল করে দিয়েছে। এছাড়া আছে গোঁড়ামিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। চারু মজুমদার শেষ লেখায় বলেছেন বৃহৎ বাম ঐক্যের কথা। কিন্তু পার্টি কি সেই দিকে যাচ্ছে? এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে 'জল অচল" করে রাখছে। যে সমস্ত গোষ্ঠী সশস্ত্র লড়াই চালাচ্ছে তাদের সবাইকে এক পার্টি শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে অসুবিধে কোথায়? ডিবেট চলুক, কিন্তু মিউচ্যুয়াল কো-অর্ডিনেশানও তো দরকার। বংশীলালকে এই কথাগুলো ও বার বার বলেছে। বংশীলাল কিছু বলেনি, নানা কথায় প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছে।

।। সাত।।

"আপকো কেয়া লগতা হ্যায়? হাম লোগোঁ কো কোই ফিকর নহী হ্যায় পার্টি কে বারে মেঁ? Yes, the question of unity is important, লেকিন উসকে লিয়ে কেয়া দুসরে issues যো হ্যাঁয় ওহ ভী ছোড় দেঁ। লগ তো রহা হ্যায় ক্রান্তি সে জী ভর গয়া হ্যায় আপকা?" রাগত স্বরে বলে উঠল বংশীলাল।

উত্তীয় ধীরে ধীরে মাথা তুলল। দুই হাঁটুর ভাঁজে মাথা ঢুকিয়ে শুনছিল এতক্ষণ। বংশীলালের চোখে চোখ রেখে বলে চলল তার মনের কথাগুলো - কেন ঐক্য জরুরি, কেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে ট্রেড ইউনিয়ন বানাতে হবে, কেন বড় চাষীদের একটা অংশকেও লড়াইয়ের ময়দানে আনতে হবে মধ্য কৃষকদের সাহায্যে ....

"We are not against forming TUs. But right not, at least Bihar, our task is to consolidate the secret apparatus of the party. You can't expect UG leaders leading mass movements like strikes and hartals!" একটু থেমে বিড়িতে একটা টান দিয়ে বংশীলাল আবার বলা শুরু করল, "আপ বোল রহে হ্যাঁয় rich peasants কে সাথ কুছ কুছ issues মেঁ ইউনাইটেড মোর্চা খড়া করনে কে লিয়ে। আপকো পতা ভী হ্যায় আপ কিসকী ভাষা বোল রহে হ্যাঁয়? Do you know that SN's essential difference with CM began on this question? He advocate unity with the rich peasants in contrast to CM's emphasis on neutralizing them through struggle. ইয়ে থিওরি ফলো করনে সে কেয়া হুয়া আপকো মালুম হ্যায়? This line devloped into that of unity with some sections of the landlords and ...."

কথা শেষ হল না বংশীলালের। ওর পায়ের কাছে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বছর ষোলোর দুখন। সারা শরীর ধুলোয় মাখা। ওকে তুলে ধরতেই উত্তীয়র হাত রক্তে চ্যাট চ্যাট করে উঠল। ঝুপড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়ার পর একটু জল খেল দুখন। ধীরে ধীরে বলতে লাগল ....

অড়হর ক্ষেতে কাজ করছিল ওরা। সন্ধ্যে নামবে খানিক পরে - কাজ শেষের কাজ চলছে। হঠাৎই প্রায় জনা দশেক লোক বন্দুক, কিরিচ ইত্যাদি নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাঁচ জনকে ওখানেই নিকেশ করেছে। দুজন কোনোক্রমে বেঁচে গেছে। যদিও তার পিঠেও কিরিচের গভীর ক্ষত।

প্রিলিমিনারি ড্রেসিং সেরে ঘরের বাইরে এল বংশীলাল। ততক্ষণে ঝুপড়ির সামনে প্রায় গোটা গ্রামের লোক এসে দাঁড়িয়েছে। বজ্রকঠিন কণ্ঠে বংশীলাল গর্জন করে উঠল, "খুন কা বদলা খুন।" উত্তেজিত গরীব কিষান হাত তুলে সম্মতি জানাল - কেঁপে উঠেন গাছপালাগুলো। মশাল হাতে মাওচিন্তা প্রচার টিমের কয়েকজন যুবক গেয়ে উঠল -

আগ হ্যায় ইয়ে আগ হ্যায়
ভুখে পেট কী আগ হ্যায়
ইয়ে আঁসুয়ো কা অঙ্গার হ্যায়
ঔর ভড়কতী যা রহী
ইয়ে ধড়কতী হুঈআগ হ্যায়।

উত্তীয় এতদিন জানত গেরিলা দল কাজ করে গোপনে, তার খবর কেউ রাখে না। এমন খোলা হাওয়ায় কেউ "খুনের বদলে খুন" বলে চিৎকার করছে, এই অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

একটু পরে বংশীলাল উত্তীয়কে ডেকে পাঠাল। দুজনে মিলে বসল দূরের একটা ন্যাড়া গাছের তলায়। মাটি থেকে গরমের ভাপ ওঠা কমে গেছে। ঠাণ্ডা না হলেও পরিবেশটা গুমোট নয়। বংশীলাল ওর দিকে তাকিয়ে হেসে একটা বিড়ি ধরাল। "লোগোঁ মেঁ ভরপুর যোশ হ্যায়," বলেই চোখ টিপে বলল, "চলো, উপর সে ছও ইঞ্চ কম কর দেতে হ্যাঁয় উন সালোঁ কা।"

উত্তীয় একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আপকো লগতা হ্যায় অ্যাইসি অ্যানিহিলেশন সে কুছ হোনোওয়ালা হ্যায়"

বংশীলাল গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, "হুমম .... পাওয়ার ভ্যাকুয়্যাম হোনে কা কোই চান্স নহী হ্যায়। লেকিন সার্ভাইভ

করনে কে লিয়ে ছোটা-মোটা সেলফ-ডিফেন্সিভ অ্যাকশন তো করনা হী হ্যায়। ওয়ার্না ইন লোগোঁ কা হিম্মত টুট যায়গা।" তারপর চশমাটা খুলে চোখ বন্ধ করে বলল, "লগ রহা হ্যায় ওহ সব অভী তক উস জগহ মেঁ হী হ্যাঁয়। চলিয়ে, বহুত কাম হ্যায়। আপকো বুলুয়া চলানা আতা হ্যায়?"

উত্তীয় মাথা নাড়ল।

।। আট ।।

ঘরের কোণে একা বসে থাকতে থাকতে রিক্তার চোখের সামনে অনেক পুরনো ছবি ভেসে ওঠে - ছেলের ছবি। সে কোনওদিন চায়নি ছেলে রাজনীতি করুক; অসীমের রাজনৈতিক জীবনের কথা বরাবর লুকিয়ে রেখেছে ওর থেকে। ছেলেও তো পড়াশোনার বাইরে কিছু করত না সেই ভাবে। অসীমের বা তার শ্বশুরমশাইয়ের পলিটিক্যাল ইনভল্‌ভমেন্টের কারণে বাড়িতে অসংখ্য রাজনৈতিক সাহিত্য থাকলেও, সেগুলো শুধুমাত্র পড়ার জন্যেই পড়েছে ছেলে। রিক্তা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবেনি কতগুলো থিওরিটিকাল জার্গন তাঁর সন্তানকে এইভাবে প্রভাবিত করবে। আসলে অসীমের জন্যেই এগুলো হয়েছে। বার বার রিক্তা বলেছে যাতে কোনওভাবেই ছেলেকে রাজনৈতিক বিষয়ে এন্টারটেন না করা হয়, তবু অসীমের কানে তোলেনি সে কথা। গত ক'মাস কোনও খবর নেই ছেলের। চিন্তায় রাতে ঘুম হয় না। অসীমকে কিছু বললে সে চুপ করে থাকে। এর ওপর গতকাল রাতে পুলিশের রেইড .... ছেলেকে এইভাবে পুলিশ তাড়া করে বেড়াবে। সমস্ত মান-সম্মান ধুলোয় মিশে গেছে এক মুহূর্তে।

ফোনটা আবার বাজছে। এই নিয়ে তিনবার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল রিক্তা।

"হ্যালো...."

উল্টোদিক থেকে কোনও কণ্ঠস্বর ভেসে এল না। রিক্তা আবার বলল, "হ্যালো .... কে বলছেন?"

এইবার উত্তর এল খানিকটা অস্বস্তি-মেশানো গলায়, "হ্যাঁ, মানে .... আমার নাম প্রজ্ঞা বসু...."

।। নয় ।।

চিরুনি-তল্লাশী শুরু হয়েছে। লখন সিং থানায় ডায়রি করেছে যে, দুখন আর ওর কিছু স্যাঙাৎ মিলে ওর ওপর চড়াও হয়েছিল খুন করার জন্য। নকশালদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথাও বলেছে। সেদিনের অ্যাকশনের পর থেকে জমিদার-পুলিশের যৌথ আক্রমণে সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়েছে। স্কোয়াড ছত্রভঙ্গ। বংশীলাল সবাইকে ম্যান্ডেট দিয়েছে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যেতে। সে নিজেও হয়তো অন্যত্র কোথাও আছে। আধমরা দুখনকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেছে। বেশ কিছু বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে ওরা। পাটনা-তে এসে উত্তীয় আশ্রয় নিয়েছে পরিচিত একজনের বাড়িতে। এটা ওর মামাবাড়ির দেশ।

মানুষগুলোকে দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় ফেলে আসতে মন চায়নি উত্তীয়র। কিন্তু উপায় কী? কে জানে কেমন আছে বুড়ো জগদীশ, লাচ্ছি, ওর বর লাল্লন, ধাতুয়া....

এতদিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফ কেটে বেশ স্বস্তি পাচ্ছিল উত্তীয়। খবরের কাগজ খুলে খুঁজতে চেষ্টা করছিল কোনও খবর আছে কিনা। নাহ। এইসব ঘটনা বিহারে এতটাই জল-ভাতের মতন যে খবরওয়ালারা কভার করার চেষ্টাই করে না। আরওয়ালের মত বিশাল কিছু না হলে "ভগবানের নিদ্রা" ভাঙে না। অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক। খবর তৈরি করে যারা পেট চালায় তাদের কাছে এর চেয়ে বেশি কীই বা আশা করা যায়?

"গুড মর্নিং।" উত্তীয় দেখল সুনন্দা ঘরে ঢুকেছে। হাতে চায়ের সরঞ্জাম। উত্তীয় হেসে সুপ্রভাত জানাল।

ছোট্ট টেবলে পিরিচ-পেয়ালা রেখে সুনন্দা বসল সামনে চেয়ারে।

"কেমন আছ এখন? কাল রাত্রেও অ্যাস্থমায় কষ্ট পেয়েছ?" সুনন্দা প্রশ্ন করল।

"ভালই। আর অ্যাস্থমা নিয়ে বেশি ভেবে কাজ নেই। ওটা আমার সঙ্গের সাথী। একটু টান না উঠলে কেমন যেন কী নেই কী নেই মনে হয়।" উত্তীয় হাসতে হাসতে উত্তর দিল।

সুনন্দা ডোডোমামা'র মেয়ে। B.I.T.'র ছাত্রী। ছুটিতে বাড়ি এসেছি। গত তিন-চার দিনে মূলতঃ ওর সাথে গল্প করেই সময় কেটেছে উত্তীয়র।

কাপে চা ঢালতে ঢালতে সুনন্দা বলল, "আচ্ছা, তোমরা কী ভাব বল তো? কয়েকজন মিলে দেশ দখল করতে পারবে? আর দখল করবেই না কেন ও কী ভাবে? একটা পীসফুল মুভমেন্ট, ইলেকশন, এইসব দিয়ে হয় না? ফাইনালি তো সাধারণ মানুষ মরছে। এইভাবে নিজের কেরিয়ার শেষ করার কোনও মানে হয় না। ইউটোপিয়ার পেছনে ছুটছ .... কী হল? কিছু বলছ না যে।"

নাকের ওপর চশমা তুলতে তুলতে সুনন্দার এইসব মতামত শুনতে উত্তীয়র ভালই লাগছিল। একটা কথারও প্রতিবাদ করছিল না। হাসছিল শুধু। কি হবে বলে? আর বলবেই বা কী? সে নিজেই তো বিভ্রান্ত।

উত্তর না পেয়ে সুনন্দা প্রশ্ন ঘোরাল, "তোমার 'তিনি' কেমন আছেন?"

"জানিনা," চুমুক দিতে দিতে জানাল উত্তীয়।

সুনন্দা চোখ গোল গোল করে বলল, "স্ট্রেঞ্জ! তুমি কি ইরেসপন্সিবল গো। জানে তুমি এখানে আছ?"

উত্তীয় মাথা নাড়ল দুদিকে।

সুনন্দা বলল, "ফোন করবে একটা? নাম্বার আছে? বাড়িতেও তো কিছু জানাতে দিলে না।

"হ্যাঁ আছে। কিন্তু এখন করতে হবে না। কলকাতা ফিরব তো। তখন না হয় দেখা করা যাবে। আর এখন বাড়িতে কিছু না জানানোই ভাল। ফালতু টেনশন।" চেয়ারে হেলান দিয়ে উত্তীয় একটা হাই তুলল। তারপর প্রশ্ন করল, "গল্পের বই-টই পড়? কার লেখা ভাল লাগে?"

সুনন্দা বিস্কুটে একটা কামড় দিয়ে চিবোতে চিবোতে জবাব দিল, "পড়ার জিনিস নিয়েই হিমশিম খেয়ে গেলাম; তার ওপর আবার গল্প।"একটু চুপ করে থেকে বলে উঠল আবার, "তবে পুজোসংখ্যাগুলো পড়ি। এখানে আসে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর নাগাদ।"

"হুমম....আর কিছু পড় না?"

"বললাম তো, সময় পাই না। উফ। তুমি না দিন দিন একটা বোর হয়ে যাচ্ছ।"

উত্তীয় হা-হা করে হেসে উঠল।

।। দশ ।।

হাওড়া স্টেশনে নেমে বড় ঘড়ির কাছে একটা STD বুথ দেখতে পেল উত্তীয়। বাড়িতে একটা ফোন করা দরকার। তিন-চারটে রিঙের পর ওপার থেকে অসীমেষের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "হ্যালো..."

"হ্যাঁ, আমি উত্তীয়।"

একটু থেমে, থমকে যাওয়া গলায় অসীমেষ জিজ্ঞেস করল, "তুই। কোথায় আছিস?"

উত্তীয় শুনতে পেল অসীমেষের পাশ থেকে রিক্তার গলার আওয়াজ, "কে ফোন করেছে? কি গো ...." উত্তীয় বলল, "এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। অবস্থা কী?"

"দু সপ্তাহ আগে রেইড হয়েছে, তুই এখন ফিরিস না কোনও ভাবেই।"

"হুমম .... তোমাদের শরীর ভাল তো? চিন্তা কোরো না। রাখছি।"

"এক মিনিট। তোর মা'র সাথে একবার কথা বল।"

"কেমন আছিস? কোথায় তুই?" কাঁপা গলায় প্রশ্ন করল রিক্তা।

"ঠিক আছি, তুমি কিছু ভেব না। পরে ফোন করব। এখন রাখি। তোমরা ...."

"তুই সাবধানে থাকিস। আমার ভয় করছে।"

"ভয়ের কিছু নেই। চিন্তা কোরো না তুমি। রাখি এখন।"

"রাখ। ও হ্যাঁ, তোর এক বন্ধু ফোন করেছিল দিন দশেক আগে।"

"কে?"

"নাম বলল প্রজ্ঞা বসু। জানতে চাইছিল তুই কোথায় আছিস।"

"আচ্ছা। এখন রাখি।"

ফোনের টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে এল ও। অনেক দূর যেতে হবে এখন। পকেটে পয়সা কম আছে, তাই বাস ধরবে না ঠিক করল। মিনিট চল্লিশ হেঁটে কলেজ স্ট্রীট পৌঁছল। এখান থেকে মেডিকাল কলেজের ভেতর দিয়ে গেলেই সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশন। টালিগঞ্জের ভাড়া কত সেন্ট্রাল থেকে? ছ'টাকা না? ফতুয়ার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট আর কিছু খুচরো পয়সা বার করল। হ্যাঁ, বেহালা অব্দি চলে যাওয়া যাবে।

টালিগঞ্জ মেট্রো স্টেশন থেকে বেরিয়ে উত্তম কুমারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল অটো স্ট্যাণ্ডের দিকে। অটোতে উঠে বলল, "সখের বাজার।" একই রকম আছে শহরটা। অদ্ভুত একটা প্রাণ আছে। পেট্রোল-পোড়া হাওয়াও যেন ভাল লাগে। ভাঙাচোরা রাস্তাগুলো বার বার করে মনে করিয়ে দেয় তাদের অস্তিত্বের কথা।

অটো থেকে নেমে রাজা জগৎ রায় রোডের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল উত্তীয়। ঢুকবে? ভাবতে ভাবতেই গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে এল প্রজ্ঞা। উত্তীয়কে প্রথমে লক্ষ্য করেনি, তারপর ওর মুখের দিকে তাকাতেই অবাক দৃষ্টিতে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থাকল। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে উঠল, "তুই। এখানে। কী হয়েছে? কেমন আছিস? কি চেহারা হয়েছে তোর।"

উত্তীয় একটু হাসল, "নাহ, এমনিই দেখা করতে এলাম। মানে, অনেক দিন তো...."

"কিভাবে দিনগুলো কাটিয়েছি জানিস? ভেতরে আসবি?"

"নাহ, জাস্ট দেখা করতে এলাম। জানতাম তোকে পেয়ে যাব এই সময়ে....."

"চল," বলে প্রজ্ঞা হাঁটতে শুরু করল। উত্তীয় চলতে লগাল পেছন পেছন। চৌরাস্তার কাছে পৌঁছে একটা ফাস্ট-ফুডের দোকানের সামনে দাঁড়াল দুজন।

"কিছু খেয়ে নে।"

"নাহ।"

"কথা না বাড়িয়ে খা। কিভাবে.... তুই কি একবারও ভাবলি না আমার কী হবে? জানিস বাড়িতে কী...."

পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করল উত্তীয়। প্রজ্ঞা হাতে একটা থাপ্পড় মেরে বিড়িটা ফেলে দিল।

"মুর্গিওয়ালাদের মত বিড়ি খাওয়াটা বন্ধ কর। একটা ফোনও কি করতে নেই?"

উত্তীয় আস্তে আস্তে বলল, "এটা রাস্তা.... প্লিজ।"

"হুঁ", প্রজ্ঞা চুপ করে গেল। "এখন কোথায় যাবি?"

"দেখি।"

"দেখি মানে? টাকা আছে?"

"যা আছে তাতে হয়ে যাবে। চাপ নিস না।"

"তার মানে নেই। পঞ্চাশে হবে?"

"বললাম তো লাগবে না। আছে আছে...."

"আমার কাছে এই মুহূর্তে পঞ্চাশই আছে। এটা নে। প্লিজ। আর একটু...." বলতে বলতে চুপ করে গেল প্রজ্ঞা।

উত্তীয় অধৈর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কী? আরে বলবি তো...."

"একটু প্র্যাক্টিকাল হ'...."

টাকাটা ওর ফতুয়ার বুকপকেটে গুঁজে দিল প্রজ্ঞা। "আসি" বলে উত্তীয় এগিয়ে গেল দূরের বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে। ফিরে তাকাল একবার, হাত নাড়ল প্রজ্ঞার উদ্দেশ্যে।

প্রজ্ঞা দেখছে উত্তীয়কে। হ্যাঁ, উত্তীয় হাঁটছে। সেটব্যাক সত্ত্বেও হাঁটছে। অস্তাচল সূর্য আজকের মত শেষবারের জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছে রক্তিম আভা। উত্তীয় হাঁটছে, মিলিয়ে যাচ্ছে মানুষের ভীড়ে।

(লেখক কলকাতার একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও রাজনৈতিক কর্মী 'তুলি কলম'-এর বিশেষ অনুরোধে গল্পটি প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন। লেখককে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।)

****

PUJA GREETINGS TO ALL MY INDIAN FRIENDS

Your Handyman

Wayne Morse

Call (303) 877-7148

FREE ESTIMATE
I TAKE PRIDE IN A JOB WELL DONE
NO JOB IS TOO LITTLE

****

আমাদের NRM (Nonresident Mother) : অথবা কিছু স্মৃতিকথা

অনুভা গোস্বামী

নীলাঞ্জনার বাড়ীতে একটা Casual dinner এ গল্প করতে করতে নীলাঞ্জনা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা যখন প্রথম এই দেশে, এই শহরে আসি তখনও দুর্গা পূজা হত কিনা। কিভাবে পুজো শুরু হলো সেই অভিজ্ঞতার কথা। বহুদিন আগেকার কথা, তাই বলতে গিয়ে কিছু মনে পড়ল আর কিছু মনে পড়ল না। কিন্তু পুরনো কথা নিয়ে চিন্তা করতে খুব ভালো লাগলো Past is sweet, তাই বাড়ি এসেও সেই স্মৃতি রোমন্থন করলাম। আরো অনেক কিছু মনে পরে গেল। এককালে এখানে দুর্গা পূজা হতই না। তারপর শুরু হলো অতি স্বল্পাকারে। প্রতি বছর স্থানীয় সদস্যদের অফুরন্ত সহযোগিতায় আস্তে আস্তে সেই পুজো ও উৎসব এখন বৃহদাকার নিয়েছে। এই জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে চিন্তা করার পর বুঝলাম এর পেছনে আছে প্রতি সদস্যদের কত শক্তি। তাই যদি না হত, তা হলে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে এই বিদেশে পুজো শুরুই বা হলো কি করে আর এত সুদীর্ঘ পথে, সুষ্ঠভাবে এসে, এত জাঁকজমক করে এই রূপ নিল কি করে।

আমরা Denver এ আসি ১৯৭৪ এর এপ্রিল মাসে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ হলো Denver ও Boulder নিবাসী বাঙ্গালীদের সাথে। যত দূর মনে পরে .... গুপ্তদা বৌদি, তাদের দুই ছেলে, প্রণবদা ও বৌদি, প্রদীপ ও কেয়া চ্যাটার্জী, নীলেন্দুদা ও মিঠু বৌদি, মানিক ও শিখা সরকার, শ্যাম ও শিরীন ও তাদের দুই মেয়ে, পালদা ও বৌদি, সৌরীন ও করেইন এবং Boulder এর শুভেন্দুদা ও বৌদির কথা। Denver ও Fort Collins এর কিছু ছাত্রও ছিল সেই সময়। এদের অনেকেই আজ আমাদের মধ্যে নেই। দেশ থেকে বিদেশে তখন সকলেই নতুন এসেছি। সুদূর বিদেশে তখন আমরা সকলেই নিজেদের স্থান করে নেবার চেষ্টায় মগ্ন। ভারতীয় কোনো দোকান তো দূরের কথা, কোনো দেশী ফল, সবজি, মাছ, মশলাপাতি কিছুই পাওয়া যেত না আমেরিকান দোকানে। তখন ছিল খালি Safeway আর kingsooper, আমাদের দুটি বাজার করার জায়গা। দোকানগুলির Cleanliness আর organization দেখে মুগ্ধ হলেও ধনে, জিরে, গরমমশলা আর ঝিঙে পটলের অভাবটাই মন খারাপ করে দিত। ফ্রোজেন ফিস আর ফ্রোজেন মিট খাওয়াই অভ্যেস করতে হলো। আমেরিকার প্রাচুর্যে আমরা তখন আনন্দের সাগরে ভেসে যাচ্ছি। হঠাৎ খেয়াল হলো, দেশে দুর্গা পুজো হলো, বিজয়া হলো, আমরাতো তাতে কোনো অংশ নিতে পারলাম না। ছোটোবেলা থেকে পুজো হবে আনন্দ করব এটাই জেনে এসেছি। কখনো ভাবিনি এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারে। সে কি হতাশা। এখন পিছন দিকে তাকিয়ে বুঝি বাঙালীতো দমবার নয় ....তাই যত দুর মনে পরে ১৯৭৬ থেকে ঠিক হলো আমরা সবাই মিলে বিজয়া করব। বিজয়া সম্মিলনী অর্থাৎ Dinner and get together. প্রথম বিজয়া সম্মেলনেই হলো কেয়া ও প্রদীপ চ্যাটার্জীর বাড়ি। মেনু হলো দেশের বিজয়া দশমীর ধাঁচে, যতটা সম্ভব ততটাই। বলাবাহুল্য প্রতিটি রান্নাই হলো আমেরিকান দোকানে যা পাওয়া যেত সেই ফল, সবজি আর মশলা দিয়ে। আমেরিকাতে বসে তখন রসগোল্লা, সন্দেশ, গজা ভাবা যায় না। রান্না হলো ঘুগনি, ব্রকলি ডাঁটার তরকারী, বড়ির বদলে ক্রটন, মাছ, মাংস, মিষ্টি। নতুন শাড়ি পরে রান্না নিয়ে প্রতিটি পরিবারই হাজির হলো। কে একজন দেশ থেকে ঢাকের টেপ এনেছিল, তাই বাজানো হলো। ভাই, দাদা, বন্ধু, সকলে সকলকে কোলাকুলি করলো। সবাই সবাইকে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা জানালাম। সে কি রোমাঞ্চ। বহুদিনের প্রতীক্ষিত দুর্গোৎসব আমরা পালন করেছি। কি ভাবে করেছি, কতটা পেরেছি তা কারুরই খেয়াল নেই। যত টুকু পাচ্ছি ততটুকু দুই হাতে লুটে পুটে নিচ্ছি। এযে আমাদের উৎসব সকলে মিলে একসাথে মেঝেতে বসে খাওয়া হলো। সকলেই খুব খুশি, আনন্দিত। ব্যাস, সব সমস্যার সমাধান তো হয়েই গেল। এবার থেকে প্রতি বছর দুর্গা পুজোর পর আমরা বিজয়া সম্মেলন করব। পরের বছর আবার হলো সৌরিনের বাড়িতে। তবে এবার খাওয়ার সাথে যোগ হলো কবিতা পাঠ ও গান বাজনা। এই তো আমরা বেশ এগিয়ে চলেছি। সুদূর বিদেশে বসে কি পাচ্ছি তা না ভাবলে চলবে না। যা পেয়েছি তাতেই খুশি।

কিন্তু খুশিতে থেমে থাকার মানুষ তো বাঙালী নয়। পুজো মানেই মনে পরে যায় পুজোর বাজার করা, নতুন জামার গন্ধ, জুতোর ফোস্কা, শারদীয়া পত্রিকা আর পুজোর গানের অপেক্ষা। দুর্গা পুজোর আগে আকাশ বাতাস জানান দিত মা আসছে। শরৎ কালে সোনায় মোড়া প্রভাতে দেবী দশভূজা এসে যেতেন আমাদের দেশে, আমাদের ঘরে, আমাদের মনে। শুরু হত তার উপাসনার প্রস্তুতি। ঢাকিদের বাজনা মনে করিয়ে দিত সময় এসে গেছে। চলে যেতাম পুজোর ফুল তুলতে। শিউলী, পদ্ম আর কত ফুল, মালা গাঁথা, মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া, নতুন জামা পরে জুতো পরে ঠাকুর দেখতে যাওয়া। ঝাল মুড়ি, ফুচকা .... সন্ধি পুজো আরও কত কি। তারপরই এসে যেত বিজয়া দশমী ও বিসর্জনের পালা। কোথায় গেল সে সব? তখনি মনে হলো আমরা যে

বিদেশে। আমাদের যেটা একেবারেই নিজের সেটা আমাদের তৈরী করে নিতে হবে। অবস্থা একেবারেই প্রতিকূল। জন সংখ্যা খুবই কম। কাজেই এই অল্প কয়েক জনে দুর্গা পূজা ভাবাই যায় না।

প্রতি বছরই কিছু নতুন বাঙালী পরিবার আসতে আরম্ভ করলো Denver এ। আমাদের বিজয়া সম্মেলনের আকারও বাড়তে লাগলো। সেই সময় New York, California র ও অন্য কিছু বড় শহরে weekend এ দুর্গা পূজা হবার কথা আমাদের কানে এলো। ১৯৮০ এর বিজয়া সম্মেলনে প্রথম আলোচনা হলো আগামী বছর আমাদের দুর্গা পুজো করার।

মায়ের পুজো ছেলেখেলা নয়। এ রাজসিক পুজো। যে দেশে ভারতীয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না সেখানে দুর্গা পূজা কি করে হবে? কিন্তু বাঙালিত থেমে থাকে না। ১৯৮১ সালে দুর্গা পূজার মাস দেড়েক আগে ঠিক হলো যা আছে তাই দিয়েই পুজো হবে। মিটিং ডাকা হলো। প্রণবদা ও বৌদির বাড়ি আমরা মিলিত হলাম। অনুপ রয় চৌধুরীর (এখন আমেরিকার অন্য শহরের বাসিন্দা) নেতৃত্বে মিটিং হলো। তখন Denver এ বাঙালী পরিবার সংখ্যা ষোলো থেকে সতের, সঙ্গে কিছু বাঙালী ছাত্র। বেশিরভাগ বাঙালীর উপস্থিতিতে সেই দিনই একটা সংঘ তৈরী হলো, নাম হলো "মিলনী"।

কিন্তু ঠাকুর কই? মানিক সরকার বললেন, আমি ঠাকুরের ব্যবস্থা করে দেব। মেশোমশাই, নীলেন্দুদার বাবা ছেলে বৌ-এর কাছে বেড়াতে এসেছেন। মেশোমশাই বললেন আমি পুজো করব। আমার কাছে বাড়িতে দৈনন্দিন পুজো করার মত কিছু ঠাকুরের বাসন ছিল। তাই ব্যবহার হলো পুজোতে। Financial budget অনুযায়ী ঠিক হলো একটা হল ভাড়া করা হবে আধা দিনের জন্য, পুজোর সময়ের কাছাকাছি কোনো এক weekendএ। সকালে পুজো, প্রসাদ বিতরণ ও সবাই মিলে পংক্তি ভোজ। সব সদস্যরা বাড়ি থেকে কিছু কিছু রান্না করে আনবেন।

আমাদের পুজো, আনন্দ আর ধরে না। আমাদের এখানে দুর্গা পুজো হবে, আমরা পুজোয় যাব। আমি, শিখা, কেয়া, মিঠু বৌদি, বিশাখা বৌদি, শিখা রয় চৌধুরী আমরা সকলে মিলে মিঠু বৌদির শাশুড়ী মায়ের নির্দেশে (instructionএ) পুজোর যোগাড় করলাম। আরো অনেকের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় পূর্ণ ছিল সেই দিন। সবার নাম লিখতে পারলাম না আর মনেও করতে পারলাম না বলে খুব খারাপ লাগছে। মানিক এঁকে ছিলেন এক অপূর্ব মহিষাসুরমর্দিনীর ছবি। পুজোর দিনে সে কি রোমাঞ্চ। অমন চমৎকার মহিষাসুরমর্দিনীর পুজো করছেন মেশোমশাই। গঙ্গা জল বা বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। অতি সামান্য উপাচার .... ফুল, জল, চন্দন, ধূপ ও প্রদীপ দিয়ে পুজো শুরু হলো। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করলেন মেশোমশাই। আজও কানে ভাসে ওনার কণ্ঠের মন্ত্রপাঠ .... "আয়ুর্দেহি, যশোদেহি, ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে ...."।।

মায়ের মুখ দেখে নয়ন ভরে না। মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে সকলে শান্তি ও ভরসা পেলাম। তারপর চরণামৃত, প্রসাদ খাওয়া ও পংক্তি ভোজ। সেই আধা দিনের পাওয়া আনন্দস্মৃতিটি মনের মণিকোঠায় তোলা আছে। পুজো সফল হলো। ঠিক হলো আসছে বছর আবার হবে।

এখন যখন সেই দিনের কথা ভাবি তখন বুঝতে পারি মেশোমশাই কত শক্তির অধিকারী ছিলেন, সময়ের থেকে কত এগিয়ে ছিলেন। সারা জীবন দেশে নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করা দেখেছেন, যেখানে নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। বিদেশে, যেখানে পুজো সামগ্রী, উপাচার এমনকি গঙ্গাজলও পাওয়া যায় না এবং পুজোর দিন ও ক্ষণও যেখানে সঠিকভাবে মানা সম্ভব নয়, এমতাবস্থায় সেইখানে মেশোমশাই পুজো করলেন। সামগ্রী বলতে ছিল আমাদের মনের আকুলতা ও ভক্তি। মেশোমশাই আমাদের প্রতিনিধি ও পথ প্রদর্শক হয়ে সেই সামগ্রীই অতি নিষ্ঠার সাথে মায়ের পায়ে ঢেলে দিলেন। স্বর্গীয় মেশোমশাইকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। ওনার দেখান পথে গিয়ে আমাদের Denver এর মিলনীর দুর্গোৎসব কত বৃহদাকার রূপ নিয়েছে।

পরের বছর পুজোর সময় মেশোমশাই দেশে ফিরে গেছেন, তাই অনুরোধে এল আমার স্বামী মানস গোস্বামীর কাছে। আমার পড়ল পুজোর যোগাড়ের কাজ। আমার স্বামী দেশে কখন পুজো করেননি। তবে ছোটোবেলা থেকে বেলুড় মঠের নিষ্ঠার সঙ্গে করা পুজো দেখেছেন। মঠের মহারাজদের সঙ্গ পাবার ও কাছ থেকে পুজো দেখারও সৌভাগ্য হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী মানস গোস্বামী পুজো না করলে পুজো হবে না। উনি আমাকে বললেন পণ্ডিতদের লেখা বই তো আছেই মন্ত্র পাঠের জন্য। মনের ভক্তি আর নিষ্ঠা দিয়ে পুজো করাই তো আসল। পুজো হলে তাহলে সবাই দুর্গোৎসবে যোগদান করতে পারবে। আমার শাশুড়ি মা, আমার মা, বাবা সবাই মত দিলেন। পুজোর যোগাড়ের কথা ভাবতে গিয়ে দেখি কিছুই বিশেষ সামগ্রী নেই, কি করি। ছোটো বেলার কিছু কথা মনে পরল। আমার বাবা কাজ উপলক্ষ্যে প্রবাসে ও বিদেশে প্রচুর থেকেছেন। প্রবাসে যখন যেখানে ছিলেন তখনি সার্বজনীন দুর্গা পূজার ব্যবস্থা করতেন। সেরকম কোন একটি জায়গায় শুনেছিলাম কোন প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ ছিল না তাই একটি ছুরির ব্যবহার হত। গঙ্গা জল পাওয়া যেত না তাই স্থানীও নদীর জল ব্যবহার হত। কাজেই আমিও বাবার সম্মতি ও সাহায্য নিয়ে যা পাওয়া যায় সাধ্যমত যোগাড় করলাম। প্রত্যেকেই

নানাভাবে যোগদান করলেন ও সহযোগিতা করলেন। আমরা দুর্গোৎসব পালন করলাম। এবার পুজোর সাথে যোগ হল cultural program. অনেকে তাতে অংশগ্রহণ করলেন। বহু বছরই আমার স্বামী পুজো করলেন। মাঝখানে কয়েক বছর কিশোরের আঁকা ছবিও পুজো হল। বাঙালীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নতুন পুরোহিতরাও পুজো করলেন; যেমন, রঘু ভট্টাচার্য্য, বিজয় ব্যানার্জী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। বছর বছর সদস্যদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। প্রতি বছর নতুন কমিটির সাথে এল নতুন ভাবনা চিন্তা, কেমন ভাবে পুজো সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সফল হয়। আমরা অনেকে একটু একটু করে দেশ থেকে পুজোর বাসন, আসন, চাঁদমালা নানারকম পুজোসামগ্রী নিয়ে লোম। আমাদের মধ্যে অনেকের দেশে যাবার সাথে পুজোসামগ্রীর বাজার করা যেন এক নতুন নেশা হয়ে দাঁড়াল। এমনকি আমার স্বামী কলকাতা থেকে অর্ডার দিয়ে ঢাকও নিয়ে এলেন। এগিয়ে চললো আমাদের পুজো নতুন প্রজন্মের হাত ধরে।

এখন মায়ের আরাধনা হয়েছে একদিন থেকে দুই দিনের। এসেছে মায়ের মূর্তি। পুজোর ম্যাগাজিন, খাবার দোকান, শাড়ির দোকান, স্থানীয় ও দেশ থেকে আর্টিস্ট এনে জলসা। এসব দেখে মনে হয় দেশের মানুষের কাছে আমরা NRI বা Nonresident Indian ঠিকই, কিন্তু আমরা এই বিদেশে বসবাসকারী বাঙ্গালীরাই আমাদের শক্তি, ইচ্ছা, মনের জোর এবং সর্বোপরি একতার বলে আমাদের এই সাত সমুদ্র পারের বাসভূমিকে আপনার করে নিতে পেরেছি মায়ের উপাসনার মধ্যে দিয়ে। সন্তানের প্রতি গর্ভধারিনি জননীর স্নেহ অপার ও শর্তহীন। সন্তান কি করল আর কি না করল তার জন্য থেমে যায় না মায়ের স্নেহ আর আশীর্ব্বাদ। আমাদের স্বল্প উপাচার, স্বল্প পূজাসামগ্রী দিয়ে, এমনকি নিরুপায়বশতঃ অনির্ধারিত দনে, সব বাধা অতিক্রম করে মায়ের পুজোর আয়োজন করেছি, অন্তর থেকে মাকে ডেকেছি। মা দুর্গা সেই আকুল ডাক ও ভক্তিতে সারা দিয়ে যে ভাবেই হোক ভিসা যোগাড় করে চলে আসেন এই অনাবাসী সন্তানদের কাছে। মা কি তখন NRM বা Nonresident Mother?

আমি এখন North Carolina তে বছরের অনেকটা সময় থাকি ছেলে, বউ ও আমার নতুন নাত্নীর সাথে। এবারে মিলনীতে কুমোরটুলির নতুন ঠাকুর। মানসদাকে এবার দুর্গা পুজো করতে হবে .... ছোটোদের আবদার। নাত্নিকে কোলে করে পুত্র ও পুত্রবধূকে এইসব কথা বলছিলাম। এই ত সেদিনের কথা, সবাই মেঝেতে বসে বিজয়া সম্মেলনী, মেশোমশাইয়ের করা প্রথম পুজো .... আর আজ, আমাদের নতুন ঠাকুর আসছে খোদ কুমোরটুলী থেকে। আমরা নাত্নিও যাবে ঠাকুর দেখতে তার মা বাবার সাথে তাদের স্থানীয় বাঙ্গালী সমিতির পুজোয়। অনেক বাঙ্গালীর মত, আমাদের পরিবারের এই তিন প্রজন্ম বিদেশে দুর্গাপুজোয় সামিল হবে। এই সৌভাগ্যের জন্য জয়ধ্বনি তুলি এদেশের অর্থাৎ USA-এর বাঙালীদের। আর প্রার্থনা করি, বাঙ্গালী তুমি বেঁচে থাক, বড় হও, বিজয়ী হও আর অসাধ্য সাধন কর।

সকলের জন্য শুভ কামনা করে বলি...

দুগ্গা দুগ্গা বল ভাই
দুগ্গা বই গতি নাই।।

আজব গ্রাম লাচার

সোমজিৎ মিত্র ও দেবশ্রী মিত্র

মেয়ে পুতুলটার গায়ে একটা সাদা নীল ডোরাকাটা ফ্রক। চোখের পাতাগুলো মিহি করে কাটা, মাথায় একটা নীল ফিতে বাঁধা। পুতুলটার বয়স তিন, আর তাকে হাতে ধরে নিয়ে চলেছে পাঁচ বছরের তোরসা। তোরসাও তার পুতুলের মত সাজ করেছে আজকে। নীল সাদা ফ্রকটা তার বাবা কিনে দিয়েছে বড়দিনের উপহারে। আজ খ্রীস্টমাস ইভ, মিসিসিপি নদীর ধারে বনফায়ার জ্বালানো হবে। তাই দেখতে লুইসিয়ানার লোকের ঢল নেমে পড়েছে এই ছোট্ট গ্রামটাতে। গ্রামটার নাম লাচার। তোরসা জন্ম থেকে দেখে আসছে এই গ্রামটাকে। ওর বাবা মা উত্তরবঙ্গের মানুষ, তোরসা নদীর ধারে ওদের বিয়ে হয়েছিল আজ থেকে দশ বছর আগে। এখানে এই বিশালকায়া মিসিসিপিকে দেখেও তোরসার মায়াবী রূপ ভুলতে পারেনি। তাই সাধ করে মেয়ের নাম রেখেছে তোরসা। তোরসা নিজেও কখনও তোরসা নদীটা দেখতে পায়নি। ভারতবর্ষে যায়ইনি ও কখনো।

আজ লাচারে পুরো উৎসব লেগে গেছে। চোদ্দ পনের বছরের ধেড়ে ধেড়ে ছেলে মাথায় টুপি পরে ভেঁপু বাজিয়ে চলেছে। মেয়েগুলো সব মুখে রঙ করে ঝলমলে জামা পরে এক কোণে দাঁড়িয়ে ফানেল কেক খাচ্ছে আর মাঝে মধ্যেই হাহা হিহি করে কলবল করছে। ভিড়ে ভিড় চারদিক, সন্ধে সাতটা বাজলেই মিসিসিপির ধারে বনফায়ারগুলো জ্বলে উঠবে। মাঝে মাঝেই একটা করে স্টীমার পোঁ শব্দ করে জলের মধ্যে ছপছপ করে এগিয়ে চলেছে। স্টীমারের নাবিক একগাল হেসে বিশাল ভুঁড়িটা বের করে দাঁড়িয়ে আছে ডেকের ওপরে।

ছোটবেলা থেকে তোরসা শুনে আসছে কলকাতার কথা। সেখানেও নাকি এরকম ভিড়, হৈ হট্টগোল হয়। কিন্তু ডিসেম্বরে নয়, অক্টোবরের মাঝামাঝি। এক দশহাতওলা ঠাকুর আছে, তার নাম দুগ্গা। তাকে নাকি কলকাতার লোকে পুজো করে। সবাই তখন সাজগোজ করে, এর ওর বাড়ি যায়, ঠাকুর দেখতে বেরোয়, মিষ্টি খায়। যত শোনে, তত ও অবাক হয়। কোনোদিন দেখে নি তো দুগ্গা ঠাকুরকে। প্রকাণ্ড গর্জনওলা সিংহের এর ওপরে চেপে দেবী দুগ্গা দাপাদাপি করে বেড়ান। সে যা হক, বনফায়ারেও তোরসার কম মজা হয় না। স্কুলে ছুটি, সবাই চারদিকে মজা করছে আর তোরসা একটা ক্যাণ্ডিফ্লস তৃপ্তি করে খাচ্ছে। একটু একটু

করে শেষ হয়ে যাচ্ছে ক্যাণ্ডিফ্লস, আর তোরসা মনে মনে ভাবছে, যদি একটা ক্যাণ্ডিফ্লস গাছ হত ওদের বাগানটাতে, ভারি মজা হত। ও মনে মনে ভাবছে, আজকে রাতে আকাশের তারাগুলো ডুবে যাবার আগে চিমনিটার গা বেয়ে পাপা নোয়েল নামবে। এই গ্রামে সান্টাক্লসকে সবাই পাপা নোয়েল বলে ডাকে। ধরো পাপা নোয়েল এবছর তোরসাকে একটা ক্যাণ্ডিফ্লস গাছ দিয়ে গেল। উঃ কি মজাটাই না হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে তোরসা বাবার হাতটা ধরতে গেছে। কিন্তু একি, ওর পুতুলটা কোথায়? কোথাও নেই তো। এই তো ওর হাতে ছিল। চোখ ফেঁপে বন্যার মত জল বেরিয়ে এল।

বাবা – "কিরে, কাঁদছিস কেন?"

তোরসার মুখে কোনো কথা নেই, শুধু কান্না ডুকরে ডুকরে উঠে আসছে।

এবার মা তাকিয়েছে ওর দিকে। একটু গম্ভীর গলায় মার প্রশ্ন – "কি ব্যাপার? এত বড় মেয়ে, কাঁদছ কেন?"

মাকে বরাবর ভয় পায় তোরসা। চোখ মুছে মার দিকে তাকিয়ে তোরসা জবাব দেয় – "পুতুলটা হারিয়ে গেছে।"

"হারিয়ে গেছে? কি করছিলি তুই? বাবা অত ভালবেসে কিনে দিল। হারিয়ে দিলি তুই? খুঁজে আন, আকুটি মেয়ে কোথাকার।"

বাবা – "আরে ছাড়োনা, এত ভিড়ে কোথায় গেছে কে জানে।"

মা – "ওঃ। একে নিয়ে আর পারিনা। যাও ওখানে চুপ করে বস। আজ আর পাপা নোয়েল কিছু দেবে না তোমায়।"

তোরসা মা এর কথা মত বন-ফায়ারের কাঠের স্তুপটার এক পাশে বসে পড়ল ধুপ করে। ওর খুব মন কেমন করছে পুতুলটার জন্য। পুতুলটাকে সাজগোজ করিয়ে, চুল আঁচড়ে আদর করে এনেছিল। কোথায় ফেলে দিল ও। কেন তোরসা সব কিছু হারিয়ে ফেলে। ও তো কিছু হারাতে চায় না। ওতো সব কিছু রেখে দিতে চায়। বাবা ওকে একবার একটা পয়সা দিয়েছিল। সেটাও তোলা আছে একটা ছোটো পাথরের বাক্সে। কোথায় গেল পুতুলটা? ভাবতে ভাবতে আরো কান্না এল ওর।

"হো হো হো" – পাশ থেকে একটা জোরে হাসির শব্দে চমকে উঠল তোরসা। দেখে কখন একটা বুড়ো লোক এসে বসেছে ওর পাশে। গায়ে পুরনো জামাকাপড়, হাতে একটা বিশাল বস্তা। কে রে বাবা?" কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। গালের চামড়াটা শুকিয়ে গেছে, মুখের তলায় প্রকাণ্ড সাদা দাড়ি। চোখের ভুরুগুলোও সাদা, মিট মিট করে হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। বাবা বলে দিয়েছিল, নো টকিং উইথ স্ট্রেঞ্জরস। কিন্তু এই

লোকটা তো কেমন চেনা চেনা। কোনো একটা বইতে যেন দেখেছে ওকে। দাঁড়াও দাঁড়াও মনে পড়েছে।

"তুমি কি পাপা নোয়েল?" জিজ্ঞেস করল তোরসা। প্রশ্নটা করেই ভাবল, পাপা নোয়েল এই ভিড়ে আসবে নাকি।

ঠোঁট উলটে বুড়ো জবাব দিল – "কে জানে?"

তোরসা – "তাহলে তুমি কে?"

বুড়ো – "তুমি কে?"

তোরসা – "আমি তোরসা। মেরি খ্রীস্টমাস।"

বুড়ো – "মেরি খ্রীস্টমাস। কিন্তু তুমি কাঁদছ কেন?"

তোরসা – "আমার পুতুলটা হারিয়ে গেছে।" কিন্তু সেটা বলতে বলতে আবার কান্না উপচে এল ওর বুক থেকে।

বুড়ো – "নো প্রব্লেম। তুমি ঠিক পেয়ে যাবে। তুমি পাপা নোয়েলের কাছে কি চাইবে আজকে?"

তোরসা প্রথমে বলতে যাচ্ছিল ক্যাণ্ডিফ্লস। কিন্তু কি মনে হল ওর, ও বলল, "আমি আমার পুতুলটা ফিরে পেতে চাই।"

ঠিক সেই সময় নদীর ধার থেকে জোর হল্লা উঠল। সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠল – "মেরি খ্রীস্টমাস।" আর সঙ্গে সঙ্গে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল বনফায়ার-গুলো। প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান শিখা ড্রাগনের মত আকাশ ফুঁড়ে ঝলসে দিল

চোখগুলো। মিসিসিপি নদীর জল আলোকিত হয়ে গেল আগুনের প্রতিবিম্বে। ঘন্টা টাওয়ারে ঢং ঢং করে বাজল সাতটা। সব কান্না ভুলে তোরসা হাঁ করে দেখল, সব্বাই নাচতে শুরু করে দিয়েছে। বুড়োটার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে, বুড়োটা নেই। কোথায় গেল বুড়োটা? এই তো ছিল। আরে ওটা কি? কি পড়ে আছে ওখানে? বুড়োটা যেখানে বসেছিল, সেখানে কি একটা পড়ে আছে।

তোরসা এগিয়ে গিয়ে দেখে, ওর পুতুলটা পড়ে আছে ওখানে। আর পুতুলটার হাতে ধরা আছে একটা ক্যাণ্ডিফ্লস। গোলাপি চকমকে ক্যাণ্ডিফ্লসের গায়ে লেখ – "মেরি খ্রীস্টমাস"। দেখে আনন্দে চকমক করে উঠল তোরসার মুখ। কে দিল ওকে এমন বড় একটা খ্রীস্টমাস উপহার? কাকে ধন্যবাদ দেবে ও? সামনের বনফায়ারটার ধোঁয়া হু হু করে আকাশের দিকে উঠে মেঘের মত হয়ে যাচ্ছে। হাঁ করে সেদিকে তাকাতে তাকাতে তোরসার মনে হল, একটা বড় ঘোড়ার গাড়ি ছুটে চলেছে ওই ধোঁয়ার মধ্যে। ঘোড়া তো নয়, ওগুলো রেনডিয়ার। আর গাড়িটাতে বসে আছে সেই বুড়োটা। মিটিমিটি হাসছে আর চিৎকার করে বলছে "হো হো হো"।

Best Wishes from :

Dr. Krishna Kumar Sinha &
Alpana Choudhuri Sinha

সম্পর্ক

অমিত নাগ

১

স্কুলগেটের কাছে পৌঁছে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে কমলিকা দেখলো তখনো পনের মিনিট বাকি আছে শুভমের স্কুল ছুটি হতে। এই জায়গাটায় একটুকুও ছায়া নেই। বাইপাসের পাশে, পূর্ব কলকাতায় এই ইন্টারন্যাশনাল স্কুলটা নতুন হয়েছে। হয়েছে মানে এখনো তৈরি হচ্ছে। তিনতলা বিরাট স্কুলবাড়িটা তৈরী হয়ে গেলেও, এখনো গাছের চারা পোঁতা চলছে ঘাসের চাদর বিছানো স্টুডেন্টদের খেলার মাঠে। আর চলছে ভিকটোরিয়ান শৈলীর রট আয়রনের বেড়া দেয়ার কাজ। কমলিকা আস্তে আস্তে বাইপাসের সামনে বাসস্ট্যান্ডের ছায়ার নীচে এসে দাঁড়িয়ে, আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছলো।

এখন বিকেল সাড়ে তিনটে, ঠিক অফিস ছুটি হবার সময় নয়। তবুও রাস্তায় কি ভীষণ ব্যস্ততা, গত গাড়ীর ছোটাছুটি। আনমনে কমলিকা ভাবছিল কারা যাচ্ছে এই গাড়ী করে, কোথায় বা যাচ্ছে তারা। এবার কমলিকার গাড়ীটার ডেলিভারি পাওয়া দরকার। কতদিন আর এভাবে বাসে অটোতে যাতায়াত করা যায়। তার আগে নতুন চাকরিটাতে জয়েন করা, প্রথম মাসের স্যালারি পাওনা না হলে, এসব গাড়ী টাড়ী কিছুই অবশ্য হবার নয়। চিন্তায় ছেদ পড়লো, একটা অটো রিকশার ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষার শব্দে। মাথায় মেহেন্দির লাল আভা, গলায় হাতে সোনার হলুদ চেনওলা ড্রাইভার মুখ বার করে, রাস্তায় পানের পিক ফেলে, কমলিকার দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, যাবেন নাকি?

কমলিকা ঘাড় নাড়লো। এখনো শুভমের ছুটি হয়নি। যাবার প্রশ্ন ওঠেনা। তবে হয়তো তাকে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, লোকটা ভেবেছে সে অটো বা ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছে। ভাবা অস্বাভাবিক নয়। কমলিকা ঘাড় নাড়লো। অটোওলা বিরক্তিভরা মুখে হাতের এক্সিলেটরে চাপ দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, গেলে ভাল করতেন। দেখবেন হয়ত পেছনেই হোন্ডা গাড়ী নিয়ে শারাফত সাহেব আসছেন, আপনাকে লিফট দেবার জন্য।

অসহ্য কটুক্তি, কদর্য ইঙ্গিত। কিছুদিন আগে, পার্ক স্ট্রীটের এক হোটেল থেকে বেরোনো একা একজন মহিলাকে লিফট দেবার নাম করে গাড়ীতে উঠিয়ে, কয়েকজন যুবক তার মর্যাদাহানি করে। সেই নিয়ে কোলকাতা তোলপাড়। বেশীরভাগ কোলকাতা-বাসী অত রাতে পার্কস্ট্রীটের হোটেলে যাওয়া মহিলার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। যেন একা মহিলা বলে, তাকে নিয়ে যা ইচ্ছে করার অধিকার সবার থাকে। কমলিকার কান লাল হয়ে ওঠে। মুখে আগুনের হাল্কা আভা বোধ করে। অটো ড্রাইভার ঐ বিশ্রী ঘটনাটার ইঙ্গিত করেছে। কমলিকার সঙ্গে ঐ রকম ঘটনা ঘটার কুৎসিত সম্ভাবনার কথা বলেছে। কমলিকার দুচোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে নোনা অশ্রুর জোয়ারে। কোলকাতার লোকগুলো কি বিশ্রী। সামান্য সহবত, শিষ্টাচার জানে না। মানুষকে সম্মান দিতে পারে না। কি সহজে, কত সামান্য প্রচেষ্টায়, তাদের আচরণ, কথা আর ব্যবহার দিয়ে এরা একজন মানুষের একটা সুন্দর দিন নষ্ট করে দিতে পারে। ব্যাথায় মন ভরিয়ে দিতে পারে। সে কি ভুল করলো আমেরিকা ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে। হঠকারিতা হল কি, অতীশের থেকে দূরে থাকবে বলে কোলকাতায় চলে আসা?

স্কুল ছুটির ঘন্টা শোনা যাচ্ছে। আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। শুভম নিশ্চয়ই এতক্ষণ গেটের কাছে ছুটে এসে পৌঁছেছে মায়ের জন্য।

২

গঙ্গা এখানে একটু কম খরস্রোতা। হিমালয় থেকে নেমে এসে গঙ্গা এখানে প্রথম সমতলে পা রাখি রাখি করছে। যেন চপল বালিকার কৈশোরে প্রবেশ। অকারণে হাসি এখনো কমেনি, তবে প্রয়োজনে গাম্ভীর্যের মুখোশও ধরতে পারে। নদীর পাড়ে হাঁটতে হাঁটতে, এই জায়গাটায় হঠাৎ চড়াও হয়ে যাওয়া, আপাত শান্ত গঙ্গার এই রূপটা দেখে কমলিকার সেইরকমই মনে হচ্ছে। গঙ্গা যেন কিশোরী এখানে। অথচ গতকাল দুকিলোমিটার উজানে যে জায়গাটায় জিপ লাইনিং করতে গিয়েছিল, সেখানে নদী অনেক বেশী খরস্রোতা। বড়ো বড়ো বোল্ডারে ধাক্কা খেয়ে রূপোলী জল আকাশের দিকে লাফিয়ে উঠছিলো। রোলার থেকে ঝুলে নদী পারাপারের সময় মাঝেমাঝে সেই সুশীতল জল কমলিকার পা ছুঁয়েছে। স্বপ্নের মত সেই অনুভূতি। একটু যে ভয় হয় নি প্রথম দিকে তা নয়। তবে ট্রেনার ভদ্রলোক প্রথম থেকেই বেশী রিস্ক নিতে দেন নি। দলের বেশীরভাগই প্রথম জিপ লাইনিং করছে বলে, ট্যান্ডেম রাইডের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটা রোলার থেকে দুজন ঝুলন্ত মানুষের নদী পারাপার। কমলিকার সঙ্গী হয়েছিলো শুভঙ্কর। তারই মত, সেও এই মাসে একই সর্বভারতীয় আই টি কোম্পানীর সল্টলেক সেক্টর ফাইভের অফিসে জয়েন করেছে। কোম্পানী অন বোর্ড ট্রেনিঙের টীম বিল্ডিং প্র্যাকটিস মডিয়ুলের জন্য, এক দল ছেলেমেয়েকে হৃষীকেশ পাঠিয়েছে। চারদিনের সেই ট্রেনিঙের আজই শেষ দিন। বিকেলে হৃষীকেশ ছেড়ে, সন্ধেবেলায় দিল্লী থেকে প্লেনে কোলকাতায় ফিরে যাওয়া। আজ তাই একটু ভোরেই উঠেছে কমলিকা। ইচ্ছে গঙ্গার ধার দিয়ে একটু

হাঁটা। গঙ্গার সঙ্গে নতুন হওয়া সখ্যতাটা, যাবার আগে, একটু মজবুত করে গড়েপিটে নেওয়া। একটা বড় পাথরে বসে নদীর জলে পা ডুবিয়ে আর পাথরে ধাক্কা খাওয়া জলের ফেনার মুখ ভিজিয়ে, মনে মনে গঙ্গার সঙ্গে কথা বলছিল কমলিকা। আবার ফিরে আসার অঙ্গীকার ভুলে না যাওয়ার প্রতিশ্রুতি। পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়া একটা পাথরের আওয়াজে হুঁশ ফিরল, পিছন ফিরে তাকাল কমলিকা। ওপরে নদীর পাড়ে ট্র্যাকশুট আর ফ্লিশের জ্যাকেট পড়ে দাঁড়িয়ে শুভঙ্কর। হেসে বললো, আপনিও বুঝি সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে গঙ্গার ধারে বেড়াতে এসেছেন? কতক্ষণ?

কমলিকা হাত নেড়ে বললো, এই কিছুক্ষণ, আয় বোস এখানে।

শুভঙ্কর ছেলেটা বেশ হাসিখুশি। কিন্তু মোটেও চ্যাংড়া ধরণের নয়। বেশ কিছুদিন আস্থা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করলেও, অন্যদের মত দেখোনদারি নেই। কথায় কথায় লেটেস্ট মডেলের আইফোন কেনার বা লাস্ট নাইটের দামি বারে যাবার গল্প করে না। হঠাৎ হঠাৎ একটা কবিতার লাইন বা পুরনো দিনের গানের দু এক কলি গেয়ে দিতে পারে। এখনকার ছেলেদের মত একদমই নয়। অফিসের কথা, ভবিষ্যতের কথা বলছিল দুজনে। অজানা কর্মজীবনের অনিশ্চয়তার কথা। না জানা আশঙ্কার কথা।

শুভঙ্কর কমলিকার থেকে পাঁচ বছরের ছোট হলেও, বেশ কিছুদিন কাজ করেছে ইন্ডাস্ট্রিতে। এধরণের চাকরি কমলিকার নতুন। আমেরিকায় থাকতে কাজ করার প্রয়োজন হয়নি কোনদিন। মাঝে মাঝে বাড়িতে একা একা ভালো না লাগার অভিযোগ তুলে, চাকরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও অতীশ কখনো কানে তোলে নি সেসব কথা। তখন তাদের মধ্যে ভালবাসা ছিল। অতীশ তাকে সুখে থাকতে দেখতে চেয়েছিল।

৩

সুখে থাকার চাবিকাঠি কি শুধুই, টাকা পয়সা আর বাড়ী গাড়ী? পরস্পরের সান্নিধ্য, সাহচর্য, ভালবাসা বিনিময়ের কি কোন প্রয়োজন নেই। লস এঞ্জেলসের অদূরে, সান বারনাডিলোর ফুট হিলসের এই বাড়ীতে, অতীশ যখন কমলিকার চোখ হাত দিয়ে বন্ধ করে এনে, তার সাম্প্রতিক সারপ্রাইজ গিফট কমলিকাকে দিয়েছিল, মনে হয়েছিল যেন স্বর্গের নন্দনকাননে এসে ঘর বসিয়েছে তারা। কল্পনার সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে এই বাড়ী, এই জায়গা চারিপাশের দৃশ্যাবলী তার মন ভরিয়ে দিয়েছে। সামনেই সারিবদ্ধ অনুচ্চ সবুজ পাহাড়ের চুড়ো, আবার এক-দেড় ঘন্টার ড্রাইভের মধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের সমুদ্রতট, লাগুনা বিচ।

পাকা রাস্তা থেকে এক মাইল ধূলোভরা ডার্ট রোড ধরে, তাদের বাড়ী পৌঁছনোর মধ্যেও কী ভীষণ একটা ভালোলাগা বোধ করতো কমলিকা। হাজার বার এই পথে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি এলেও কখনো পুরনো মনে হয়নি। বাড়ির দেড় একর জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল বেশ কিছু আভোকাডো গাছ, ভালেন্সিয়া লেবুর গাছ। কোলকাতা থেকে লুকিয়ে নিয়ে আসা গন্ধরাজ লেবুর চারা, জুঁই ফুলের চারা কিছুদিনের মধ্যেই তরতর করে বেড়ে উঠে দিয়েছে সুগন্ধি ফল ও ফুল। দেশের বাইরে নিজের মত করে এক চিলতে দেশ গড়তে চেয়েছিল কমলিকা, তাদের দেড় একরের মানচিত্রে। বড় যত্ন করে বাড়ি সাজিয়েছিল নিজের মনের মতো করে। বাছাই করা পর্দা, ল্যাম্পসেড, সোফা, লাভসীট, ডাইনিং টেবিল সেট কিনেছে পছন্দসই দোকান থেকে। তার সঙ্গে দেশ থেকে আনা পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোশ, মঞ্জুষার শোলার তৈরি দুর্গার মূর্তি, মধ্যপ্রদেশের ডোকরার ভাস্কর্য। বাড়ি নিয়ে তার পাগলামির শেষ ছিল না। ঘর বাড়ি যাতে একঘেয়ে পুরনো না মনে হয়, তাই প্রায়দিন বাড়ির আসবাবপত্তরের স্থান পরিবর্তন করে, একটু আধটু সাজ পালটে দিত সে। অতীশকে অবাক করে দেবে বলে এসব করে, স্নান সেরে, সাজগোজ করে, পশ্চিমের বারান্দায় বেতের সোফায় বসে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে অতীশের জন্য অপেক্ষা করতো সে। প্রথম প্রথম অফিসের থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সে সব দেখে হইচই বাধিয়ে দিত অতীশ। তারপর আস্তে আস্তে অফিসে তার পদোন্নতি হল, দায়িত্ব বাড়ল, অর্থ প্রতিপত্তি বাড়ল, আর তার সঙ্গে তাল দিয়ে বাড়ল দেরি করে, রাত করে বাড়ি ফেরা। ততদিনে শুভম এসে গেছে। কতদিন শুভমকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে দিতে ওর পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে কমলিকা। অতীশ অফিস থেকে ফিরে ওকে ডাকে নি। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে নিজের মতো। এ নিয়ে বললেই অতীশ বলেছে, সে ক্লান্ত ছিল। বুঝতে চায় নি তার জন্য অপেক্ষা করে করে কমলিকাও কতখানি ক্লান্ত।

আর কিছু চায় নি কমলিকা অতীশের কাছে। শুধু একটু সময়, খানিক সঙ্গ আর সাহচর্য। কমলিকা আমুদে, হৈ চৈ ভালোবাসে। জীবনটা হাল্কা ভাবে হেসেখেলে সহজভাবে উপভোগ করে কাটিয়ে দিতে চায়। ওর এই গুণগুলোর জন্যই একদিন অতীশ কমলিকার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল। ইউনিভার্সিটির সেই দিনগুলোতে, ঐ আপাত মূল্যহীন, সরল হৈ চৈ আর হুল্লোড়পনার জন্যই, কম্পিউটার সায়েন্সের মাস্টার ডিগ্রীর ছাত্র ক্লাস পালিয়ে কমলিকার সঙ্গ উপভোগ করতে এসেছে কতদিন। প্রাথমিক ভালোলাগা, মুগ্ধতা কবে যে একদিন ভালবাসার সম্পর্কে উত্তীর্ণ হোল, দুজনের কেউ তা বুঝতে পারে নি। সেই অতীশের এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে নি সে। প্রথম প্রথম কতদিন কান্নাকাটি আর অভিমান করেছে। শেষে সহ্য করতে না পেরে একদিন চরম সিদ্ধান্ত নেবার কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছে। অতীশের থেকে মুক্তি চায় সে। জীবনটাকে নিজের মতো করে নিজের শর্তে বাঁচতে চায় সে আবার নতুন করে। হয়তো আর একটু সহনশীল হওয়া উচিত ছিল তার। কলেজের

দিনগুলোতে আর সারা জীবনের জন্য নয়। দাম্পত্য মানেই যে কম্প্রোমাইস, সে কি তা বোঝে না। কিন্তু অতীশেরও তো কিছুটা কম্প্রোমাইস করা উচিত ছিল না। সমস্ত মানিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব কি শুধু কমলিকার একার। নিজের ইচ্ছে সম্মান বন্ধক রেখে, মেকি সাজানো সুখের সংসার করতে মন আর সায় দেয়নি। অতীশের কাছে ডিভোর্স চায় সে। সম্পত্তি খোরপোষের আশা করে নি সে। শুধু চেয়েছে শুভমের অধিকার পেতে। আদালতে অতীশের অন্য রূপ দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। শুভমকে নিজের কাছে রাখার দাবি মজবুত করতে কমলিকাকে পাগোল প্রমাণ করার চেষ্টা অবধি করতে চেয়েছে অতীশ। অতীশকে ভালবেসে, একদিন সে বাড়ীর সকলের মতের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে একা, সেই অতীশের এই ব্যবহার বিশ্বাস হয় নি। লোরেটো গার্লস, লেডি ব্রাবোন, যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাত্র কমলিকা। বাবা নামী মারকেন্টাইল কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। উত্তরবঙ্গ থেকে কোলকাতায় পড়তে আসা চা বাগানের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ছেলে অতীশের সঙ্গে বিয়েতে বাড়ীর সবাই আপত্তি তুলেছিল। বাবার ঘোরতর অমত ছিল বিয়েতে। সকলের মতের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে সে অতীশকে বিয়ে করেছে, শুধুমাত্র তাদের সম্পর্কটাকে বিশ্বাস করে। আজ সেই সম্পর্কের এই পরিণতি কমলিকা মেনে নিতে পারে নি। তাই ডিভোর্সের মামলা শেষ হতেই, শুভমকে নিয়ে অতীশের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে কোলকাতায় চলে এসেছে। কিছু শুভানুধ্যায়ী তারো ছিল। যাদের সাক্ষ্য, বিচারে তাকে শুভমকে পেতে সাহায্য করেছে। সাম্প্রতিক খবরে শোনা নরওয়ে প্রবাসী সেই বাঙালি ভদ্রমহিলার মতো নিদারুণ ভাগ্য অন্তত তার হয় নি। সন্তানের দেখভাল করার দায়িত্বহীনতার কারণ দেখিয়ে তার ছেলেকে যখন নরওয়ে সরকার জাতীয় হেফাজতে নিয়ে নেয়, সেই মহিলার স্বামীও, ছেলেকে নিজের কাছে পেতে, নিজের স্ত্রীর মানসিকতার স্বাভাবিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ডিভোর্স চায়। ঘটনাপ্রবাহ যেদিকে বয়ে চলেছে তাতে হয়তো ভদ্রমহিলা তার সন্তানকে নিজের কাছে পাবেন না। প্রেমের, বিশ্বাসের এই পরিণতি কমলিকার হৃদয়কে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। প্রেমহীন প্রিয়জন সান্নিধ্যহীন এই আপোষকামী জীবন আর টেনে নিয়ে চলার আর্তি বোধ করে নি সে মনের ভিতর থেকে। অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকারে একলা ঝাঁপ দিয়েছে সে। শুধুমাত্র অতীতের হানা দেওয়ার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে।

শুভমকে নিয়ে যে নিঃসঙ্গ কমলিকা যখন নতুন করে জীবন শুরু করার অঙ্গীকার নিয়ে কোলকাতায় এনে পৌঁছল, তখন সে আক্ষরিক অর্থেই সম্বলহীন। হাতে থাকার মতো শুধু সদ্য উপার্জিত আমেরিকান ইউনিভার্সিটির একটা মাস্টার ডিগ্রী। অতীশের সঙ্গে দুর্বিসহ শেষ দুবছর থাকার সময়, বাস্তবকে ভুলে থাকতে অন-লাইন কোর্স করে যা সে সংগ্রহ করেছে।

৪

নিউটাউন রাজারহাটের এই জায়গাটাকে একেবারেই কোলকাতা বলে মনে হয় না। সুদীর্ঘ সরল, চওড়া চওড়া অ্যাসফাল্টের রাস্তা, মাঝখানে ডিভাইডারে কেয়ারী করা ফুল, গাছপালা আর সুদৃশ্য লাইটপোস্ট। দুপাশে সমান্তরালে চলা ফ্রন্টেজ রোড, সাইকেল আর ছোটো গাড়ীর জন্য। দিগন্তে উঁচু উঁচু গ্লাস আর স্টিলের অফিস বাড়ী, বিরাট হাই রাইস এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স দেখে, জায়গাটা কেমন বিদেশ বিদেশ মনে হচ্ছিলো কমলিকার। প্রায় এক যুগ সে দেশের বাইরে কাটিয়েছে। আর সেই সময়টাতে, কোলকাতা যেন তার পঞ্চাশ বছরের সুদীর্ঘ ঘুম থেকে উঠে, গা ঝাড়া দিয়ে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের দৌড়ে যোগ দেবার, দেরী করে হলেও একটা প্রচেষ্টা শুরু করেছে। সেটা ভাল না মন্দ, তা বোঝার সময় হয়তো এখনো আসেনি।

পনেরো তলা উঁচুতে শুভঙ্করের এই এপার্টমেন্টটাও খুব সুন্দর। শীতের প্রায় শেষ। নীল আকাশে সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘেরা আলসেমি ভরা ভঙ্গিমায় ভেসে চলেছে, যেন কোন তাড়া নেই কোথাও যাবার। উন্মুক্ত বিরাট কাঁচের জানলা দিয়ে কমলিকা দমদমের দিকে নামতে যাওয়া আর উড়ে আসা প্লেনগুলো দেখছিলো একমনে। এই সব প্লেনে কত মানুষ আজ প্রথম কোথাও যাচ্ছে - তাদের চেনা গন্ডির চেনা দেশের পরিচিতির বাইরে। নতুন জীবন, নতুন আশার সন্ধানে, ঠিক যেমন অতীশের কাছে কমলিকা গিয়েছিলো একদিন।

সম্বিত ফিরলো মাসীমার ডাকে। চলো খাবার দেওয়া হয়েছে এই শুভ তোর ...., বললেন মাসীমা। শুভঙ্কর জোরাজুরি করে আজ কমলিকাকে তাদের বাড়ী নেমন্তন্ন করে এনেছে, মায়ের সাথে আলাপ করিয়ে দেবে বলে। কমলিকা আসতে চায় নি। কিন্তু শুভঙ্করের ছেলেমানুষি আব্দারের কাছে তার আপত্তি টিকলো না। শেষ পর্যন্ত আসতেই হল। মাসীমা অনেক রেঁধেছেন - মোচার ঘন্টা, লাউ, কচুশাক, মাছের মুইঠ্যা আরো কত কি। দেশ ছাড়ার পর এসব খাবারের কথা স্মৃতি থেকে ফিকে হয়ে এসেছিল। ছেলেবেলায়ও এরকম খাবার খুব কমই খেয়েছে কমলিকা। বাবার ছিল সাহেবি মানসিকতা। ভাল খাবার মানেই পার্ক স্ট্রীটের কোনও ওয়েস্টার্ন বা চাইনীজ রেস্টুর‍্যান্ট। এই দেখেই বড় হয়েছে সে। শুভঙ্করের কাছে শুনেছে, একাত্তরের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বাবা মা এদেশে চলে আসেন। বনগাঁর দিকে, অশোকনগরের কলোনীতে কেটেছে তার ছেলেবেলা। পড়াশুনোয় ভাল ছিল বলে, কিছুটা সংগ্রাম করতে হলেও শেষপর্যন্ত দাঁড়িয়ে যায় ছেলেটা। এই নতুন এপার্টমেন্টটায় বছরখানিক হল উঠে এসেছে বিধবা মাকে নিয়ে

সল্টলেকের ভাড়াবাড়ী ছেড়ে।

এদের আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারছিল না কমলিকা। অনেকদিন এমন যত্ন করে তাকে কেউ খাবার সাজিয়ে দেয় নি। মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আর কে কে আছেন তোমার বাড়ীতে?" এক ছেলে শুনে বললেন, "আর স্বামী কি করে?" কমলিকাকে চুপ থাকতে দেখে শুভঙ্করই ...., "ওর ছেলেই ওর সব মা।" "মাসীমার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিলো না, তিনি এর কি অর্থ করলেন। আজকাল এদেশেও নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা প্রায়ই শোনা যায়। মাসীমার প্রজন্মের মানুষেরা তার খবর কতটা রাখে, কমলিকার জানা নেই। তাছাড়া তার মতো অফিসের সহকর্মী একজন মেয়েকে ছেলের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে ডেকে আনায় তিনি কি ভাবছেন, তাও কমলিকার জানা নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে আনার জন্য, সে তার পুরনো দিনের আমুদে মেজাজে বলল। "শুভঙ্করের একটা বিয়ে দিচ্ছেন না কেন মাসীমা?" – এতো সুন্দর বাড়ী, ভাল চাকরী, আর কিসের জন্য অপেক্ষা করছেন?" এরকম প্রশ্ন বোধহয় উনি আগেও অনেক শুনেছেন। গড়গড় করে বলতে লাগলেন, কি ভাবে কলেজের দিনগুলো থেকে বেড়ে ওঠা শুভঙ্করের একটা সম্পর্ক একদিন হঠাৎ করে ভেঙ্গে গেল। কিভাবে কল্পনারও বাইরে, তার অতি উচ্চাশী বান্ধবী একদিন শুভঙ্করের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক মিটিয়ে দিয়ে চলে গেল তার নিজের অফিসের বসের সঙ্গে ঘর বাঁধতে, মাসীমা তার বর্ণনা দিয়ে গেলেন শুভঙ্করের আপত্তি সত্ত্বেও। ছেলের অসহায় মৃদু প্রতিবাদ মায়ের জমে থাকা দুঃখস্রোতের কাছে ভেসে গেল খড়কুটোর মতো।

বাড়ী ফিরতে ফিরতে কমলিকার মনে হচ্ছিল, লড়াইটা সে শুধু একলাই করছে না। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, হয়ত সবারই নিজস্ব একটা কষ্ট, একান্তে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া একটা লড়াই আছে। বাইরে থেকে তা সবসময় হয়ত বোঝা যায় না। কোলকাতা শহরের দৃশ্যমান বাহির জীবনের চলমান সংগ্রামের স্রোতের মধ্যেও, কেউ কেউ নিজের অন্তরবেদনা ঢেকে রেখে, নিজস্ব আরও একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়েই যেমন শুভঙ্কর।

৫

কদিন ধরে শুভঙ্করকে দেখা যায় নি। ওর সুন্দর ব্যবহার, অন্যের জন্য ওর চিন্তা, অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ওর সহজাত অভ্যাস, রোজ রোজ দেখা হলে আলাদা করে উপলব্ধি করা যায় না। এই কদিন দেখতে না পেয়ে, ওর অনুপস্থিতি কমলিকাকে যেন একটু বেশিই অনুভব করছে। অবাক লাগছে ভেবে, কেমন সামান্য হলেও, একটু যেন বিষন্ন বোধ করছে শুভঙ্কর না থাকায়। পরশু ফোন করার সময়, মাসীমা ফোন তুলেছিলেন বাড়ীতে। বললেন, ওর নাকি ঠান্ডা লেগে অল্প জ্বরজ্বারি হয়েছে। শীত যাই যাই করে, বসন্ত আসার তোড়জোড় চলছে কোলকাতার বাতাসে। ফেব্রুয়ারীর এই সময়টাতে এমন ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া কিছু আশ্চর্যের নয়। কদিন ধরে অফিসে খুব কাজের চাপ চলছে।

আমেরিকায় একটা নতুন ক্লায়েন্ট ধরার জন্য কোম্পানি নেগোশিয়েট করার চেষ্টা করছে খুব। আমেরিকায় থাকার আর ওদের কালচার পরিচিতির অভিজ্ঞতার জন্য ক্লায়েন্ট মিটিং-এ ওকে সঙ্গে রেখেছে বস। সেই সব ভিডিও কনফারেন্স মিটিং শেষ করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে কদিন খুব রাত হয়ে গেছে। আজ সকালবেলায় কমলিকা তাই একটু ক্লান্তি বোধ করছে। শুভমটাও সন্ধেবেলা মাকে কাছে না পেয়ে, একটু অভিমানী হয়েছে আজকাল। সন্ধেবেলাটা তাকে দিদার বাড়ীতে একলা থাকতে হয়েছে। আগে কখনো সখনো সন্ধেবেলায় মাঝে মাঝে অফিস ফেরৎ শুভঙ্কর এসেছে ওদের বাড়ী। শুভমের সঙ্গে মজার মজার সব খেলা হয়েছে ওদের। শুভঙ্কর ছোটদের সঙ্গে ছেলেমানুষ হয়ে যাবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্যে আর ওর নামের সঙ্গে নিজের নামের মিল খুঁজে পেয়ে, শুভম খুব সহজেই ওর বন্ধু হয়ে গেছে। এক সপ্তাহ শুভঙ্করও আসেনা ওদের বাড়ী শরীর খারাপ হওয়ায়। আজ তাই কমলিকা ভাবছিল, সন্ধ্যে হলে ছেলেকে নিয়ে কোন রেস্টুরেন্টে খেতে যাবে, অথবা নিদেনপক্ষে তার মাসতুতো বোনের বাড়ী। এই একঘেয়েমীর একটা পরিবর্তন সামান্য হলেও আজ একটু অন্যরকম ভাবে সময় কাটাবে সে গতানুগতিকতা ছেড়ে। ওয়াটার বোটলটায় জল ভরে নিজের কিউবিকলে ফিরতেই দেখা শুভঙ্করের সাথে। টেবিলের পাশে রাখা এক্সট্রা চেয়ারটায় এতক্ষণ বসছিল সে। কমলিকাকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে ...., 'চলুন সিটি সেন্টারে যাই কফি খেতে। এখন তো প্রায় লাঞ্চটাইম। কেউ খেয়াল করবে না।" "কখন এলি, এখন কেমন আছিস," অবাক হয়ে বলল কমলিকা। "এতদিন শরীর খারাপ হয়ে বিছানায় পড়েছিলি, আগে একটু বোস" ওর কথার জবাব না দিয়ে প্রায় টানতে টানতে, কমলিকাকে লিফটের ভেতর ঢুকিয়ে নিয়ে পার্কিং লেভেলের বোতাম টিপে দিলো শুভঙ্কর।

বারিস্তা কফিশপের ভেতরে এক কোণার দিকের টেবিলে বসলো দুজনে। অনাদরে বেড়ে ওঠা গোঁফদাড়ি, ঝাঁকড়া চুলের একটা ছেলে গীটার বাজিয়ে গান করে যাচ্ছিলো আপন মনে। বাংলা ব্যান্ডের গান, নিজের লেখা গান। দেখে মনে হয় কলেজের ছাত্র, হয়তো সে নিজেও কাস্টমার একজন এই কফিশপের। ঝকঝকে পোষাকের উজ্জ্বল কিছু ছেলেমেয়ে কফি বানানো, সারভিং করার জন্য হালকা পায়ে দ্রুত ছুটে বেড়াচ্ছিলো এ টেবিল থেকে ও টেবিল। তার মাঝেই একটু দাঁড়িয়ে নেওয়া, পুরনো চেনা কোন কাস্টমারে গায়ে হাল্কা ঠেলা দিয়ে মজার কোন কথা ভাগাভাগি করে নেওয়া, হাসিতে গড়িয়ে

পড়া। দেখতে মন্দ লাগছিলো না। কমলিকার ছেলেবেলায় কলেজ স্ট্রীট আর যাদবপুরের ইন্ডিয়ান কফি হাউস ছাড়া আর কোন কফি হাউস ছিল না। তার পরিবেশ আর এই উজ্জ্বল রঙে সাজানো আধুনিক কফি হাউসের আবহাওয়ার মধ্যে কোন মিল নেই। কমলিকা ভাবছিল এখনকার ছেলেমেয়েরা কত সহজেই কতো কিছু পেয়ে যাচ্ছে জীবনে। সে সবের মূল্য কি তারা বুঝতে পারে? শুভঙ্কর আজ একটু চুপচাপ, মুখখানা অল্প বিষন্ন। কমলিকার চেনা রোজকার শুভঙ্করের থেকে আলাদা।

সদ্য তৈরি এক পট কফি রেখে গেছে বারিস্তার মেয়েটি। তাজা ব্রু করা কফির গন্ধ আর উষ্ণতা অনুভব করছিল কমলিকা তার স্নায়ুতন্ত্রিতে। তারা দুজনেই কেউ ব্ল্যাক কফি খায় না। টেবিলের এক পাশে ক্রিম আর চিনিও রাখা আছে। কিন্তু শুভঙ্করের কি যেন কেন আজ কফি বানানোয় মন নেই। চামচের উল্টোদিক দিয়ে টেবিলের ওপর পাতা সাদা কাগজটায় আঁকিবুঁকি কাটা থামিয়ে এক সময় সে বলে ওঠে ঃ 'কমলিকা আপনাকে একটা কথা বলার ছিল' এই নৈঃশব্দ কমলিকার ভাল লাগছে না একদম। নৈঃশব্দ, বরফ ভাঙ্গানোর জন্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে - "কি কথা?" শুভঙ্কর একটু থেমে একটা ছোট নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, "কদিন ধরেই তোমাকে কথাটা বলব ভাবছিলাম। কিন্তু কিভাবে কোথায় বললে তোমার কোন আঘাত লাগবে না ভেবে পাচ্ছিলাম না। এই কদিনে তোমায় যতটুকু দেখেছি, তোমার আমার চিন্তাভাবনা মানসিকতা রুচিতে, জীবনছন্দে কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পেয়েছি। কমলিকা বেশি কিছু চাইবো না। বাকি পথটুকু একসঙ্গে পাড়ি দেওয়ার জন্যে, আমি কি তোমায় জীবনের পথে চলার সঙ্গী হিসেবে পেতে পারি?" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে, একটু দম নিল শুভঙ্কর। এমন যে কিছু একটা বলে বসতে পারে শুভঙ্কর কোনো একদিন, এমন আশঙ্কা মাঝে মাঝে কমলিকা যে করেনি তা নয়। কিন্তা তা যে এত তাড়াতাড়ি, আজই, এইখানে কমলিকা তা কল্পনা করে নি। কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। বাকি জীবন চলার জন্যে, কি করা উচিত? এখনো ভেবে উঠতে পারে নি সে। কমলিকাকে নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে ব্যাকুল হয়ে শুভঙ্কর বলে ওঠে, "তোমাকে হারাতে চাই না আমি কিছুতেই, অন্তত বন্ধু হিসেবেও তোমার পাশে থাকতে চাই আমি। চিরাচরিত প্রথাগত সম্পর্কের সঙ্গে জড়ানোর চাহিদাগুলোর কিছুই করব না আমি। শুধু তোমার পাশে পাশে আমাকে একটু চলতে দিও কমলিকা।" শুভঙ্করের কণ্ঠস্বরের আর্তি আর ব্যাকুলতায় মন কেমন করে ওঠে কমলিকার। কি বলবে সে জানে না, কোন সম্পর্কের আশা সে দেবে শুভঙ্করকে, তাও তার জানা নেই এই মুহূর্তে। সে শুধু দেখেছে শুভঙ্করের উদ্যোগ, তাকে হারানোর আশঙ্কাজনিত বিষন্নতা। আজ শুভঙ্কর প্রথম তাকে আপনি থেকে তুমি বলে সম্বোধন করেছে। এসব কি শুধুই তাকে একজন সাধারণ বন্ধু হিসেবে পাওয়ার জন্য? আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কমলিকা শুধু বলে, "তুমি কি আমায় একটু সময় দিতে পারো শুভঙ্কর?" শুভঙ্কর সামান্য মাথা নেড়ে, একটু করুণ হেসে, তাড়াতাড়ি একটা কাপ টেনে নিয়ে কমলিকার জন্য কফি বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেন এই পরিস্থিতিটা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে এমনই একটা মুহূর্তের অপেক্ষা করছিল সে। তার আচরণ দেখে কমলিকা বুঝতে পারছে, অনেকদিন ধরে একটু একটু করে এই মুহূর্তটার জন্যে সাহস সঞ্চয় করেছে সে, প্রস্তুতি নিয়েছে। এখন সবশেষ। পরিণতি কি হবে তা তার জানা নেই। শুভঙ্করের জন্য মায়া হচ্ছিল কমলিকার। তার দিকে বাড়ান কফি কাপটা নিয়ে চুমুকু দিতে গিয়ে দেখলো শুট প্যান্ট পরা মধ্যবয়সী একজন ভদ্রলোক, শুভঙ্করের দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাসিমুখে তাকিয়ে রয়েছে।

"তারপর শুভঙ্কর, কি খবর? কতদিন পরে দেখা বলো?" শুভঙ্কর আলাপ করিয়ে দিল ভদ্রলোকের সঙ্গে। পুরনো অফিসের বস। আগের অফিসের দুচার কথার পর, শুভঙ্করের দিকে সামান্য হেলে ফিসফিস করে অথচ কমলিকা যেন শুনতে পায় এমন করে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "গার্ল ফ্রেন্ড নাকি?" শুভঙ্কর এমনিতেই মরমে মরে ছিল। খসখসে উদাস কণ্ঠে খানিকটা দার্শনিকভাবে ...., "পথের সাথী মিঃ দত্ত - হয়ত তাই, নয়তো তাও নয়, ঠিক জানা নেই।" মিঃ দত্ত এমন উত্তর আশা করেন নি। তবে জীবনে অভিজ্ঞতার ঝুলি তারও কম নয়। প্রাথমিক হতচকিত ভাবটা দ্রুত কাটিয়ে নিয়ে মুখে একটা ভাব করলেন যেন এমন কথা আগেও অনেক শুনেছেন। চোখ কুঁচকে, ভ্রু ভঙ্গিমায় আমুদে রেশ টেনে বললেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, ..." বলেই হাসি হাসি মুখে হন হন করে দোকানের বাইরে হাঁটা দিলেন। কমলিকা ভাবছিল এরকম মানুষ সে আগেও অনেক দেখেছে। জগৎটাকে এরা স্রেফ সাদা কালোর হিসেবে দেখে। সাদা কালোর মধ্যে একটা বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তর পড়ে আছে, তা এদের চোখে ধরা পড়ে না। কমলিকার হঠাৎ কেন জানি ভীষণ মজা লাগল। অল্প হেসে .... "তাড়াতাড়ি কফি শেষ করো। অফিসে ফিরতে হবে না বুঝি।"

শুভঙ্কর তার কফিটা একটু বেশীই মিষ্টি করে ফেলেছে। এতটা মিষ্টি সে খায় না। তবু এ নিয়ে কিছু বলল না আজ। তার মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, জীবন মানেই কম্প্রোমাইজ, জীবন মানেই মানিয়ে চলা।

৬

আজ অফিস থেকে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়লো কমলিকা। এ সপ্তাহটায় বড্ড ধকল গেছে। রোজ লেট নাইট মিটিং, শুভমের রোজ

সন্ধেবেলায় মাকে কাছে না পাওয়া। মনটা একটু খচখচ করছিল। এই উইক-এন্ডটার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে-ছিলো সে। আজ শুভমকে একটা ট্রিট দিতে হবে, তার অভিমান ভোলানোর জন্য। ভাগ্যিস অফিসের সামনে থেকেই একটা শেয়ারের ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিলো বেরতে না বেরতেই। তাই রুবি হসপিটালের কাছে ই এম বাইপাশের স্কুলে পৌঁছে গেল ছুটি হবার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে। ছেলেকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আবার বিস্ময়। কি আশ্চর্য, ধাঁ করে কোথা থেকে একটা অটো এসে দাঁড়ালো সামনে। "যাবেন নাকি দিদি? আমি আনোয়ার শাহ কানেক্টরের দিকে গাড়ী গ্যারেজ করতে যাচ্ছি ঃ" হাসিমুখে জানাল মধ্যবয়সী ড্রাইভারটি। ছেলেকে নিয়ে উঠে বসতে না বসতেই হু হু করে গাড়ী ছুটিয়ে দিলো ড্রাইভার। মাত্র দুজন যাত্রী তারা। পরপর তিনটে বাসস্ট্যান্ড পেরিয়ে গেলো গাড়ী, একটুও স্পীড না কমিয়ে। কমলিকা অবাক একটু অস্বস্তিও যে না হচ্ছে তা নয়। জিজ্ঞাসা করলো, "ভাই আপনি আর কোন প্যাসেঞ্জার তুলবেন না?"

না দিদি গাড়ীর গ্যারাজ করেই ছেলেকে স্কুল থেকে তুলতে হবে। কাল ওর যাদবপুর বিদ্যাপীঠের এডমিশন টেস্ট। মা বাবার, মানে আমাদেরও নাকি ইন্টারভিউ নেবে বলেছে। আজ আমার তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরা দরকার। মালিক মানতে চায় না দিদি। অটো চালাই বলে কি আমাদের পরিবার থাকতে নেই? ছেলেটার পড়াশুনার মাথাটা ভালো। একটা ভালো স্কুলে চান্স পাবার জন্যে অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছি। মানসিক প্রস্তুতি বলেও তো একটা ব্যাপার আছে? ঠিক কি না আপনিই বলুন? একদিন আগে গাড়ী গ্যারাজ করলে কি এমন হয় বলুন?

কমলিকার থেকে একটা সাপোর্ট চাইছিল লোকটা। এই লোকটাও তার নিজের মতো একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ছেলেকে জীবনে দাঁড় করনোর। তার মতো সাচ্ছল্যহীনতা, দারিদ্র্য আর অনিশ্চয়তার বৃত্ত থেকে সন্তানকে মুক্তি দেবার। কমলিকার ভাল লাগলো কথাগুলো। .... "নিশ্চয়ই ভাই পরিবার নিশ্চয়ই সবার আগে। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাইপাস ছেড়ে আনোয়ার শাহ কানেক্টরে ঢুকে পড়েছে আটো। এই রাস্তাটা বছর পনের হল হয়েছে। এর মধ্যেই দুধারে লাগানো গাছগুলো ঝাঁকড়া হয়ে বেড়ে উঠে পরস্পরের হাত ধরাধারি করে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া গাছগুলো ফুলে ফুলে মাথার ওপর আগুনের চাঁদোয়া বিছিয়ে দিয়েছে যেন। এমন রাস্তাকেই বিদেশে এভিনিউ বলে। এখন বসন্তকাল। কয়েকদিন পরেই দোল। রঙের উৎসব। জীবনের যৌবনের জয়গাঁথার।

শুভম বলল, মা শুভঙ্কর আংকেল আর আমাদের বাড়ীতে আসে না কেন? কমলিকা বলল, "শরীর খারাপ হয়েছিল তো তাই আসতে পারে নি বোধহয়। এই তো আবার আসবে দোলের দিন, তোমার সংগে রঙ খেলতে।"

শুভমের বোধহয় ভাল লাগলো কথাটা। হাসি হাসি মুখে আব্দার করে বলল, কাল তো ছুটি, উইক-এন্ড। আজকে কিন্তু আজ বাড়ীর খাবার খাব না। কমলিকা আগেই ভেবে রেখেছিলো। বলল, চলো আজ আমরা পিৎজা হাটে যাই। শুভম হৈ হৈ করে মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আই লাভ ইউ মম। কমলিকার মনে হলো শুধু। — একটা দুটো মুহূর্তের জন্য, জীবনের হাজার ঝড়ঝাপ্টা সওয়া যায়।

শীত চলে গেলেও এখনো তেমন গরম পড়ে নি। ছুটন্ত অটোর বাইরে থেকে ধেয়ে আসা হাওয়ায় দারুণ একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আমেজ। কপালের ওপর থেকে উড়ন্ত দামাল চুলগুলো সরাতে সরাতে কমলিকার মনে হলো, আমেরিকা থেকে ফিরে আসার পর প্রথম প্রথম যেমন খারাপ লাগতো, কোলকাতাকে এখন আর তেমন লাগছে না। কোলকাতার সব মানুষও হয়ত তেমন খারাপ নয়। ভাল লোকও কিছু আছে নিশ্চয়ই। তাদের কয়েকজনের দেখা তো সে নিজেও পেয়েছে। একটা ভালো লাগার আবেশে আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ছোঁয়ায় তার চোখ বুজে এলো। মনে হলো, এ শহরে আবার নতুন করে শিকড় গাঁথার কথা ভাবা যায়।

Mother—Maa

Mita Mukherjee

In Bengali, the word "MA" means mother, it is usually the first word that comes out of a baby's mouth; other languages have different words depicting mother such as mummy, mataji, bai, mamma, mater, mommy dearest etc but somehow the word "ma" encompasses the simple meaning of what a mother represents.

This is a tribute to my own mother.

One Saturday morning I got the dreaded phone call; all of us who live so far away from their families, I think, subconsciously keep waiting for these phone calls.

My sister called to say that my mother had a stroke, meaning a brain infarct. I know from my medical background that a stroke victim needs to be treated at once to have any sort of good outcome. In India especially in Kolkata at once means more like three or four hours, there is no such thing as 911.

At least they had performed a CT-scan and had her taken to the ICU. However there was a massive Doctor's conference going on in Mumbai and there were no neurologists available, the resident Dr. did what ever he could, while I waited with bated breath waiting for news.

I started making preparations to go at once and then realized that I had just returned from India a month back, and some new rule states that without an OCI card I couldn't enter my own homeland even in the face of such an emergency within 60 days!

After we filled out this long form asking permission to enter my own country, trying to get a live person on the phone to ask questions seemed like a miracle, we finally sent off the form, my passport and necessary documents to Washington, they said three or four days at the most— we started the waiting game.

It took seven long days to get the documents, I left the next day praying that I would still be able to see her—the Dr. had said that it would be a miracle if she survived—the CT scan showed that the left brain was totally compromised.

I was finally at her bedside, holding her hand, calling "Ma—ma I am here-I shook her hand, patted her shoulder, willing her to wake up and recognize me but to no avail.

She lay there eyes closed, breathing through the oxygen tube, a feeding tube hanging out of her mouth, making guttural sounds.

Deep sadness washed over me, my eyes welled with tears, I had just seen her only a month back and she had said to me while I was leaving, "you came, but we didn't get any time to talk, I have so many things I wanted to say but never got the chance—you were so busy running here and there you didn't have time for me,"

"I know –this time I don't know where the time went, but I will be back in December and I will make sure I can come and stay with you". I saw deep sadness in her eyes, perhaps she knew that there will be no next time.

My mother has been my rock , my mentor, my guide, I can't believe that I won't be able to call and share my thoughts with her.

We brought her home but she lies locked inside her non-functioning brain, with very little awareness of what is going on around her.

There is a slow improvement in her paralyzed arm and leg and maybe some awareness. The other day I called and they put the phone to her ear and I said, "MA—Ma—ami bolchi—Bubu—shunte parcho?"I was amazed when she replied, "HA---yes!" I was overjoyed!

I can only say enjoy your parents and loved ones while you have the opportunity, nobody knows what is in store for us. Thank you all for letting me share my thoughts with you.

পুরাতনী

সোমনাথ রায়

সবই তো পুরোনো হয়ে আসে
ঝিকমিকে রোদ্দুর, বিকেলের ফিকে হওয়া আলো
বিপন্ন চোখে চোখে মায়ারা যে স্বপ্ন বসালো
কী সহজে তারাও ফ্যাকাশে
মিছিলের উত্তুঙ্গ দাবি
শহরের রাজপথে জনরোষ, লড়াকু নিশান
ভোর আসবেই ভেবে ভিতরের ঘুমভাঙা গান
সে স্লোগানও অস্তস্বভাবী
খুঁজে পাওয়া সূর্যের দেশ
রাতের দেওয়ালে ছিল সেই স্বপ্নের ছবি আঁকা
বিষাদের বুক নিয়ে গঙ্গার ঘাটে একা একা
আজ তার ধ্বংসাবশেষ
এসবই ফুরিয়ে গ্যাছে শোনো
হলুদ ছবিরা আর অ্যালবাম, কবিতার বই
রাত নেমে এলে আমি তোর নাম ধরে চ্যাঁচাবোই
সেই নামও অতীব পুরোনো

(সমসাময়িক এই কবির বই প্রকাশিত হল গত কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায়। 'তুলি কলম'-এর তরফ থেকে কবিকে শুভেচ্ছা জানাই)

পালকের মত ঠিক

অনির্বাণ চক্রবর্তী

রাত ফিকে হয়ে এলে -
নরম চাঁদের আলো,
নিঃশর্তে নেমে পড়ে জলের মতন।

জলজ প্রাণীরা বেশ নড়েচড়ে -
এপাশ ওপাশ,
আর হাওয়ায় ভাসে কিছু পাখির পালক।

পালকের মতন সাদা -
তিরতিরে মুখখানা -
পরম মমতায় ঠিক টেনে নিই বুকের ভিতর।

কিম্বা বুকের ভিতর তুই,
থেকে যাস বেশ কিছুক্ষণ।

জীবন

সুশীল সিংহ

মানুষের –
কোনো কোনো মানুষের জীবনে
একটা সময় আসে
যখন তার নিজের জন্য
শোক ও ধ্যান করতে হয়।

শোক! ধ্যান! নিজের জন্য! আশ্চর্য।

এই আশ্চর্যের কোনো উত্তর দিও না।
– আমার বাবা, আমায় এরকম নির্দেশ দিয়েছেন।

তোর ভেতর
বার্তা .... সংকেত .... ভাষা আসবে
শুধু ধ্বনিতে। ধ্বনি । বাতাসের প্রতি তরঙ্গে
আঁকিবুকি, ধ্বনিময় অজস্র অক্ষর
স্পষ্ট ও সহজ, কোনো বর্ণমালা নেই
যা এই জগতের বহমান মাতৃভাষা -
একদিন ঠিক শুনতে পাবি।

এখন তোর ভেতর
টেলিগ্রাফের খুঁটি পোতার জন্য
মাটি খোঁড়া হচ্ছে
আগে চাঙ চাঙ মাঠি উঠুক। ঢিবি হোক।

ক্রমে খাম্বা, টানা তারে, তারে তারে
দশদিক .... সমুদ্রতল .... শূন্য থেকে
বাতাসের টরেটক্কা টরেটক্কা টরেটক্কা

– শুকিয়ে কাঠ হয়ে যা।

চোখে জল দেখি! ভালো।
একা .... নিঃশব্দ .... কান্না ভালো।
মাটি নরম হবে।

বসে যা। নিজেকে প্রনাম কর।
এখন তোর শোক। এখন তোর ধ্যান। নিজের জন্য।
আর বলব না।

আমার বাবা, আমায় এরকম নির্দেশ দিয়েছেন।

শুক ও সারী

নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত

টেবিলের সমকোণে বসেছিল ওরা
যেন ঠিক জ্যামিতিক নিয়মে,
লম্বভাবে হাত বাড়ালে মিলে যায় আঙ্গুলের ডগা।
(তবে তা ব্যস্ত ছিল সুপের স্পুন আর লেটুসের র‍্যপে)
ভেসে আসা চৈনিক সুরের কম্পন
গড়াচ্ছিল দুজনার ত্বকে।
ঝিম ধরা নেশুড়ে আলোয়
মাঝে মাঝে কাটছিল দৃষ্টিকে দৃষ্টি,
– পরম শূণ্যে।
বাক্যহীন নিস্তব্ধতার নির্ব্যাজ সুখের হিমে, জমে ছিল পাশের টেবিল,
(যেন একচেটিয়া!)
আর ভেংচি কাটছিল আমাদের দরকচা স্ক্রাব্বেলর গুনগুন খিচুরিকে।

খটখটে ঘ্যানঘ্যানে বিদায় সম্ভাষণ
ভেঙ্গে দিন নিলম্বন।
নাকেতে O_2 র নল,
ওর সাদা রোঁয়া হাতে ভর দিল অন্য হাত –
তেমাথা লাঠির পরও!
মুখে টেপা মালঞ্চ হাসি– চোখেতে ডুবুরি চোখ,
হাতের পাতায়ে হাত-পার হলো exit door.

পিতামহ, তোমাকে মনে পরে যায় –

জলচর

সুবীর বোস

মাঝে মাঝে খুব মনে পড়ে
সে এক দুপুর দৃশ্য – অগোছালো আনাড়ি টিফিন –
মাঝে মাঝে মনে পড়ে প্রথম প্রলাপ

রোমন্থনে গাঢ় মাঠ ভিজে গেলে – টাপুর-টুপুর
মাঝে মাঝে টের পাই আসলের থেকে সুদ কী হিসেবে দামী!

লিখলে চিঠি

সায়ন্তন গোস্বামী

অনেক দূরে মরীচগন্ধ বন
সেখান থেকে লিখলে চিঠি আমায়
ডাকবাক্স নেই, কেবলই হাওয়ায়
পাতাবাহার গাছের শেকল মন

তিনখানি ভাঁজ কাগজ বিক্ষত
শেকড়বিহীন এমন যদি হয়
অক্ষরে সেই দূরে থাকার ভয়
বাদাম শব্দ ঝরেছে অবিরত

শরৎ এসে চোখে লাগার আগে
অপত্য এক স্নেহের কাছাকাছি
বৃদ্ধ পাঠক সজাগ হয়ে আছি
পড়ছি চিঠি ভালবাসায়, রাগে।

(এই কবির কবিতার বই সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। 'তুলি-কলম'-এর তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই।)

অনামিকা তুমি শোনো

সুবীর বোস

তোমার গালের তিল, জানি মৃত্যুভ্রূণ – ওখানেই
কেতাবী মোড়ক আর আবেগী আঙুল পোড়া রাগে
যতবার বেজে উঠি – টের পাই ক্ষয়ে গেছি প্রেমে।
আমি তো নিরীহ জন শরীরে তোমার মেঘ মেখে
চিনেছি পাহাড়ী স্রোত তিলে তিলে, মেখেছি আবেগ
বোতামের, নুপূরের - ছুঁয়ে গেছি তোমার ধ্রুপদ।

তবু কেন পথ ভুলি প্রহরের অনিত্য প্রবাহে!
কেন আজ সঞ্চিত আয়ুর ত্বকে তীব্র বিষ টোকা মেরে যায়!
অথচ আমি তো আজ খুব জানি - জানি কুয়াশাতে
শরীরের ছায়া গাঁথে পাথরের অলীক শব্দেরা –
জানি এই আমি একা জেগে আছি ভ্রমরের ছাঁচে
আর তুমি অন্য কেউ – ভালোবাসা অন্য কোনও লয়

এই মোহ, এই দ্বন্দ্ব, আর যত চিরস্থায়ী ক্ষয়
এই নিয়ে বেঁচে আছি অনামিকা – আলাপে-ঝালায়।

(কবি 'দেশ' এবং বিভিন্ন Little Magazine-এর নিয়মিত লেখক)

অনাবিষ্কৃত

শ্রদ্ধা পত্রনবীশ

১)
ডালপালা গজিয়ে গিয়েছে শ্যাওলায় ....
এতদিন পর, সবুজের বুকের ভিতর
লাল কষ্ট অভ্যাসের মতো রয়ে রয়ে
একেবারে দিয়েছে ক্ষইয়ে সমস্ত শিকড়
হাজার লক্ষ দিন পর, হে নিষ্ঠুর ঈশ্বর
ঠোঁট ফাঁক করে জল খেতে চেও না অমন -
কান্না পায় মাথা জুড়ে,
শুরু হয় অবিশ্রান্ত রক্তক্ষরণ !!

২)
জোনাকি জ্বলে না এ শহরে,
বৃষ্টিগুলো গরম বাড়ায় .....
আমি তাও ভিজে যেতে চাই
ছাড় রঙা অজস্র ধারায় ....

৩)
শুধু ভুলগুলো দেখেছে সবাই
ভুলের মধ্যে থাকা ঠিকগুলো
নজর এড়িয়ে গেছে সব্বার,
যা গিয়েছে সে না হয় যাক ....
সবার কথাও আমি ভাবি না এখন ....
শুধু তুমি হে প্রেমিক,
হে আমার প্রাণের শহর
পাঁক থেকে মুঠো ভরে পদ্মফুল নিও

৪)
আজ শহরে বৃষ্টি নেমেছিল ....
তবু মানুষের মুখগুলোতে অসন্তোষ !
পাঁচটা চড়াই জানালার রেলিং এ বসে
বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় যখন
আমি তখন দ্রুত হেঁটে গিয়েছিলাম
গা-মাথা ভেজাবো না বলে ....
কেউ বলেছিল, একদিন ছাদে গিয়ে বৃষ্টি ভিজতে -
কিন্তু, আসলে সিনেমায় যেমন হয়
এ শহরে তা অসম্ভব !!

৫)
থালায় এখন সর্ষে দিয়ে পারশে মাছের ঝাল,
গন্ধলেবু, ধোঁয়া ওঠা ভাত, ডাল ....
'আমার ফেরবার তাড়া রয়েছে, মা' ....
যদিও বিষাদ জননীর হেঁশেলের বাইরে রয়েছে !
'আমার ফেরবার তাড়া রয়েছে, মা'
সোনার-চুড়ি-হাত থেকে শব্দ উঠে বলে,
'ভালো করে খা,
কে জানে পরের বার দেখা হবে কিনা !'

শারদ বার্তা

কৌশিক চক্রবর্তী

শরৎ এসেছে,
সাজিয়ে আজি – কাশ শিউলির ডালা,
নীল আকাশের প্রাঙ্গণে
ভাসে সাদা মেঘের ভেলা।
শারদ প্রাতের সমীরণে
আজ মিষ্টি ফুলের সুবাস,
স্নিগ্ধ প্রভাতে আমোদিত –
হল হিমেল হাওয়ার প্রয়াস।
নরম শুভ্র মেঘের কোলে
আনন্দ বার্তা আজি,
প্রকৃতি উঠল পরমা হয়ে –
পরাণ ভরিয়া সাজি।
মধুর সুরে নিনাদিত –
আজি আগমনীর গান,
এসেছে শরৎ, আসছে পুজো –
ভরিয়া উঠিল প্রাণ।।

না স্নেহকরস্পর্শ

সুব্রত সরকার

কি লিখি অগ্নিবর্ণ, মৃত্যুর পথে যদি মেঘ রক্ত-বমি করে ভোলায়
চন্দ্রমুখী, কাউকে
ভালবাসিত না, কিন্তু সে ভালবাসিত না
অশ্রু, শরৎচন্দ্র
এখানে অপ্রকাশিত হয়ে থাকুক ও দেবদাস
তুমি নিজের কথা বল।

এই সুযোগ, কারণ
বাজারে তরিতরকারিদের মাঝে রঙিন লুকিয়ে থাকে, তাদের
সু-স্বাস্থ্য, নারীদের প্রিয় ও দর্পিত
মুখ পার্বতীর, মন্দ হলেও
তা সত্য, তবু সকল পুরুষের কোনো স্নেহকরস্পর্শের
প্রয়োজন নেই।

কারণ সে সন্ধান পেয়েছিল আসব বিপণির অন্ধকারে
সুধা ঠিক কিভাবে মনে
প্রবেশ করবে, সিংহ-হৃদয় দুয়ারে তার গো শকট যদি না
পৌঁছায়, দোষ কারুর নয়, রাত্রিযামে
প্রেত ডেকে ওঠেঃ
"তুমি কি সহস্রের কেউ হও, না
একজনার ?"

হাস্য, কালো হাস্য কখনো কি দেখিয়াছ নারী ?
শব অবধ্য, মূক, চিরস্থির।
আমি তার কি করিতে পারি ?

দূর থেকে দেখা .....

সংগীতা দাশগুপ্ত রায়

আপদকালীন বোঝাপড়ার সুতোয়
বুনছ বসে বাহারী সংকেত
বিছিয়ে রাখা মখমলি রোদ্দুরে
সেঁকছ সবুজ সংসারী ধানক্ষেত।

ঘোর তমাশায় চোখ জ্বলে যায়, তবু
আলনা গোছাও, আয়না মোছো রোম,
দিন ফুরোলে গুনগুনিয়ে আঁকো
চাঁদের গায়ে একফালি সংকোচ।

(কবি দেশ এবং আনন্দবাজার পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা)

ইচ্ছা

সংগীতা দাশগুপ্ত রায়

ঐশ্বরিক কোনও ক্ষমতা থাকলে
আমি ঈশ্বরকেই তোমার মুখোমুখো বসাতাম
তারপর হিসেব চাইতাম ওই সব ছলনার
যা বুনে আর বিছিয়ে
তুমি আমাকে নিঃসাড় করেছ....
হিসেব চাইতাম সেই সব পরশের
যা আজও শরীর থেকে ছিঁড়ে ফেলতে পারিনি
অথবা
আয়নাকে সাক্ষী রেখে তোমার হাত বেঁধে
প্রবল চুম্বনে তোমার অস্তিত্ব টেনে নিতমা জিভের
জেহাদে

কিছু একটা নিশ্চয়ই করতাম
যদি তুমি অন্তত সামনে আসার মত সাহসী হতে
একটিবার

সমাধান

১ বে	না	র	২ স	■	৩ শা	৪ র	দ
লু	■	■	হ	■	■	ত্ন	■
ড়	■	৫ কা	জি	য়া	■	৬ হা	৭ সি
৮ ম	হা	মা	য়া	■	৯ আ	র	ক্ত
ঠ	■	খ্যা	■	১০ হি	ম	■	■
■	■	■	১১ স	মা	জ	■	১২ অ
১৩ ক	■	১৪ র	■	১৫ চ	ন	ম	নে
১৬ বি	শ্বা	স	■	১৭ ল	তা	■	ক

গরুর গাড়ীর হেডলাইট

অমিত নাগ

টুপি দিয়ে ঢাকি টাক
শাক দিয়ে মাছ
আমরা যা নই তাই
হবো অভিলাষ
ফুরবে সকল কথা
জানলে স্বরূপ
মুড়বে নকল নটেগাছ।

বাড়ি চাই গাড়ী চাই
ফরেনেতে ট্রিপ
মার্কেট ইকনমি
জীবন আধুনিক।
বুটিক শপের
কেনা জামা
ডিজাইনার
দেখালে নিশ্চিত
পাবো বাহবা সবার।

এই সব সাত পাঁচ
ভেবে অবশেষে
কৃষ্ণ গেল পশ্চিমে
Chris রূপ বেশে

ঘুরে এসে বার্লিন
ছুঁয়ে বাভারিয়া
ঘরে ফিরে দেখে
কেনা ব্রান্ডেড জামা
কলারের কাছে লেখা
মেড ইন ইণ্ডিয়া।

গা বাঁচিয়ে চলি

শুভময় গাঙ্গুলী

দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে কেউ কথা বলেনি,
ভীষ্ম-বিদুর নমস্যরা কোনও রা কাড়েনি,
উচিত কথা বলতে গিয়ে ঝামেলায় পড়ি কেন?
নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত জীবন আমাদের থাকে যেন।
অন্যায়ের প্রতিবাদে যেন (কোনও) কথা না বলি,
মহাভারতের ট্র্যাডিশন আজও (তবু) মেনে চলি।।

থানাতে পুলিশ, ট্রেনেতে T.T.(E.) ঘুষ খায় দেখি তবু,
অভিযোগটা Complaint book-এ লিখি না আমরা কভু।
পাড়ার মেয়েরা উত্যক্ত অশ্লীল মন্তব্যে,
শুনেও না শুনি, না থেমে চলে যাই গন্তব্যে;
"গোল্লায় গেছে দেশটা" - এ-কথা বলি, বিড়বিড় করেই বলি,
মহাভারতের ট্র্যাডিশন আজও মেনে চলি।।

দুর্নীতিতে গিয়েছে ভরে সারা হিন্দুস্থান
তবু যেন থাকি দুধে-ভাতে, সাথে নিয়ে সন্তান।
বনের মোষ কে তাড়াতে যাবে যুদ্ধের বাজারে?
প্রতিবাদটা করলে করুক আন্না হাজারে।।
ধরি মাছ তবু না ছুঁই পানি, গা বাঁচিয়ে চলি;
মহাভারতের ট্র্যাডিশন আজও (তবু) মেনে চলি।।

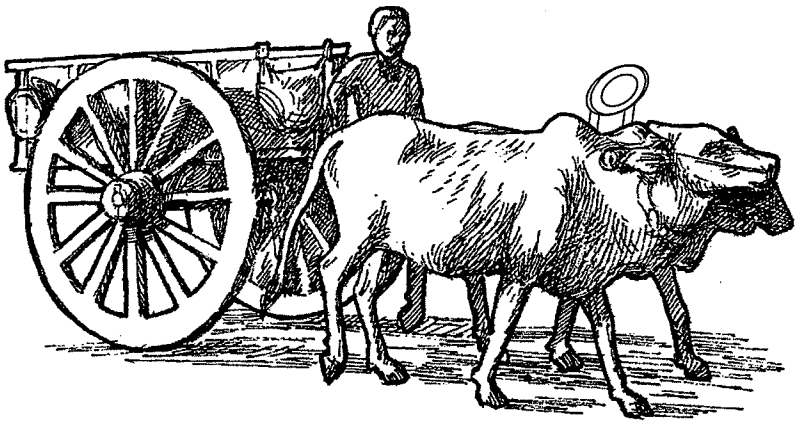

Is Love Unconditional ?

Roshmi Bhowmik

Is love a state of mind ?
When we feel it, do we start to accept ourselves ?
Is patience the first step towards it?

Is forgiveness a big part of it too ?

If we stop feeling love, was it ever love ?
If we do not feel love, is life ever worth it ?

Is it something we can feel for only one person ?

If we feel so for one person can we feel this way about others?
Does the intensity of love keep growing over time?

Is it a fatal addiction ?

Are we ready for it ?
Is it the path to obliterate Self?

Does it help us accept ourselves if we receive love ?

Is it always there whether we acknowledge it or not?
Does its realization lead to the ultimate union?

My Traveler's Mind

Mousumi Bhattacharya

I traveled through the forest
I traveled through the wood
I traveled through the mountains
As far as I could
I tried to touch the Horizon
As much I could see
I sailed on the rivers
I swam in the sea
I climbed up to the Canyon
Tried to listen what birds are telling
Walked on the glacier
Saw Northern Light, can't express my feeling
Roaming around the World
Something I always miss
Nowhere, nowhere
Probably I was looking for peace
I realized something
After all my roam
My traveler's mind said
Let's go back to home.

TWILIGHT---years

Mita Mukherjee

T he darkness creeps in insidious and sure
W illing myself to look forward and not back
I nspite of my advise to myself, my mind dwells
L ives in the past far away those were the days, when
I nvolved in activities, I had no time, no minutes to spare
G one are those glorious times, those fleeting moments
H ow quickly life marches by, childhood, youth and adulthood, and now
T ime has stopped, every minute an hour, every day a year !

Please can I go back, relive those moments
Savor the taste, smell the scent
Share the joy, share the love
Smile the smile and glory in "THE TODAY"
In all its best !!

My Last Trip with my Grandma and Grandpa in Colorado

Agni Obin Basu

As I start to wake up, I realize that it's the 2nd day of summer and I am going on a car trip to Almont, CO. Woohoo! We were going to go Rough River rafting!!! I got out of bed and raced downstairs. When my parents asked what I was going to eat I said Cheerios then, I asked if I could eat downstairs today my parents said yes. So I watched TV for 30 minutes in my basement. When I got back upstairs I drank my milk, ate my gummies, and headed to my bathroom to take a shower. After I was done with my shower and had changed we got all of
the stuff packed and we put into the trunk of our Honda Pilot. Then we hopped in our car and took off for the mountains.

We stopped for lunch at a subway. Grandpa had a cup of coffee after we finished lunch. Next, we stopped at the top of Cottonwood Pass and walked on a trail. Then we returned to our car but not before taking a few pictures, though.

After what seemed like forever reached our cabin in Almont. We got out stretched and looked at our cabin. This is going to be a very good trip I thought to myself. Oh and did I mention our cabin was right next to a restaurant?

The next few days we just relaxed, the TV didn't work so I watched YouTube while my grandma and grandpa and my parents just talked with each other. One day, I was trying to skip rocks on the lake and my foot fell into a hole with guck in it. I took my foot out of my crocs and my foot was covered with black guck. "Yuck!" I said. When I went home though, my parents and grandparents had a different reaction altogether. "Ewwww!" they all seemed to reply. "Go wash your foot," my mom ordered. "That's just what I was thinking." I said. "And take a
bath while you're at It." my mom said. "OK" I replied. So I took a bath and watched more YouTube because I wasn't allowed to go back outside.

The second to last day we were about to go rafting when we took a walk. I found these horseshoes and a tiny pole I threw a horseshoe at the pole and made it. My dad tried after me and he missed his first try but made it on his second try. My mom missed. We went on our walk after that and took some pictures. After the walk we went rafting.

Our guide was Justin who was working there for summer because his college was nearby. The other guide for the other family was Daniel. The rafting was awesome! At first I was helping paddling but then at the White Water Park there was a festival and rapids so I got to sit in the front. I got splashed and it was fun, the rest of the trip wasn't that fun it was just river.

After the raft I changed and we got in the car. The family we rafted with was kind of crazy but they were cool. We drove to Starbucks and I got a Cookie Crumble Frapuchinno that I shared with grandma when we got back to the cabin. (Unfortunately, grandpa and grandma couldn't go rafting with us.)

The next day we packed and got ready to go, I was sad but not that sad because I would finally watch TV when we got back home! We returned our key and started on our 6 hour trip (The delay was due to stopping for lunch and for pictures) back home. When we finally got home I was happy and went to go play with my friend, Gavin. It was a good last- car- trip with grandma and grandma and I'm sure they enjoyed it too.

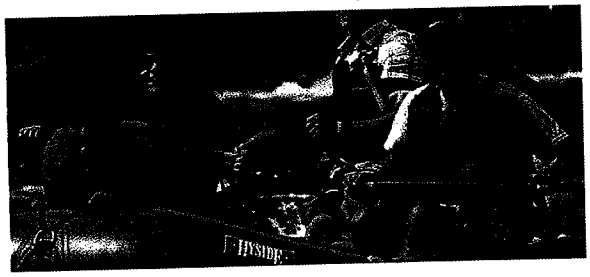

Aahana Nandi

Why You Should Not Eat Candy

Portia Bhattacharjee, Kritika Krori, and Ishana Banerjee

One day you and me were going to a world similar to Earth called Earthy. Earthy would be exactly the same as Earth, but it isn't because everything there is wacky. So we are going to a party but you see a candy store and you want some candy. You pick a candy which looks like it's sweet, but once you eat it, it is as sour as lemon and makes your poor teeth yellow and sour. Then you have to go to the dentist who tells you the only way to get your teeth back to normal is to pull all your teeth out and get fake teeth. You didn't like that but had to do it. After the painful time at the dentist's office, we decide to go to the party. When it was dinnertime, you take one bite and all your teeth fall out! Everybody but me laughs, "Ha, ha, ha!" You get mad and see some water balloons and throw one to everybody but me and you see that all the water balloons had rocks inside them. Everybody but me and you go to the hospital with a big purple bump. The next day you want to go to the dentist's office again. We get there and see police officers arresting the dentist. You ask them why they are arresting the dentist. One of the police officers tells you that he was a fake dentist and his brother was a candy store owner and he sold candy that made your teeth sour and yellow. The candy store owner had been arrested too. That's why you should never eat candy.

Rupkatha Biswas

Ma Durga

Medha Pan (9 years)

Ma Durga, Ma Durga
You saved us all
From the demon of course
He captured us all

With your 10 hands
You were brave enough to
Stab him on the chest
With the Trishul

We worship you
On this very day
We call it Durga Puja
Hooray, Hooray

Bio-Poem

Sanjana Nandy

Friendly positive joyous unique
Big sister of admirable Aahana
Lover of my magnificent mom and dynamite dad and the mesmerizing mountain views
Who feels drowsiness in the morning, happiness to seeing friends at school, and excitement when schools out
Who needs extra hours of sleep, more visits to Elitch Gardens, and bright lights during Christmas time
Who fears of surprising pop quizzes, to watch horror movies by myself and rodents that might be lurking in restaurants
Who gives amusement to friends, help to my parents around the house and liveliness to a classroom
Who like to see different countries like London, Costa Rica and Australia
Resident of a good piece to play on the piano

Nino

Srijita Ghoshal (Tultul) Age 9

My cute little baby brother Nino
Loves to play with Dino
His soft cheeks are tempting to touch
But believe me he's too much.
His cute little eyes make you cry
That's something I rely.
He still drolls
But I think it's cool.
He, my baby brother, rules.
He chased a butterfly down the street.
Wow, Nino can surely make you beat.

My Thoughts

Srijita Ghoshal

My thoughts are somethime rot
Though I think a lot
Or sometimes not,
I may have thousands of thoughts
But they always get caught into knots.
I'm proud of my thoughts.

Through my eyes

Pourna Sengupta

Golden eyes,
black furry white.
Watching the world around me.
Not blending in but enjoying it-
to see the world bustling.
Clouds fly like birds above the majestic me.
I run away taking the grass with me .

How the Tiger Got Its Stripes

Aritra Nag , Age 10

As you all know, the tiger is the king of the forest. It runs swiftly with its black stripes blending in with the night. But at one point of time, the beast didn't have its beautiful stripes. Here's how the story starts. One day, Sheroo the tiger, was lazily lying in the grass field. It was his naptime. In fact, the whole day was his naptime. He was only active for two hours the entire day. When he would lie down for an afternoon snooze, the shadow of the grass would cast all over his body. He always admired his look when the shadows were on him. If only I had stripes, thought Sheroo. Just then, he sensed a movement. It's only a few humans. They won't disturb me, thought Sheroo just to comfort himself. But he saw they were carrying those steel tree branches that imitated the sound of thunder, which he had seen many of his fellow friends die from. He tried to stay hidden in the long grass, which was a bit of help, but his bright orange body conspicuously contrasted with the dark green grass. The poachers easily spotted him. They were coming near him and fast. His instincts told him to run. Run until you feel they are totally gone. So off he went tearing through the field. He heard the sound of a gunshot. He suddenly felt a sharp pain on his side. They had hit him. But nothing could stop him now. No matter how much it hurt, he wouldn't stop running. Finally after an hour or so, he took a break. Right in front of him was a pond. Maybe if he was lucky, there might be a deer or two, which he could eat because he was starving. But right now, all he cared about was for a drink of water. He figured he would stay here for the night. He just plopped down under a shady tree, and instantly fell asleep. When he woke up, he was bumping around in a mechanical elephant with wheels. He tried to get up, but the ceiling was too low. He looked all around himself. He was locked in a cage on a truck driven by men. He knew he was caught. The next day, the vehicle stopped in front of the only building for 300 miles around. This building was a laboratory. This was a place where scientists would use animals to test the effect of drugs on them. Sheroo was taken inside. There, he saw sick animals, insane animals, and to his horror dead animals. But the scientist assigned to work on Sheroo surprisingly treated animals like they were other humans. He was very kind to them. And he knew that this was a Bengal tiger, an endangered and extremely rare animal. So when everybody had gone home and he had told his boss that he would be working late tonight, he took a truck with a cage and put Sheroo in and drove him back to a forest. The laboratory chief was upset with the scientist. He punished the scientist for freeing the tiger that was essential for them to test on. The scientist was forbidden to come anywhere near the laboratory ever again. But the caring man was satisfied from saving an animal of the endangered species, which was the right thing to do. Sheroo wasn't aware of any of these. He was happy to be free again. Sheroo lay quietly in the grassy field. A warm feeling swept over him like you feel when you are grateful. He fell asleep. When he woke up in the morning, he got up, and a timber wolf walked up to him and said, "Where did you get those magnificent stripes? I really need some of those!" Sheroo was confused. "What do you mean?" "What do you mean 'what do you mean'? Sheroo looked at his body. There were black stripes. He got up to check if they were just the grasses' shadows. They weren't all right! When Sheroo had gone to sleep the night before, the good feeling he was having was actually the shadows of the grass melting on to his orange hide. To this day, when you see a tiger, you definitely know that they have stripes because of one special tiger. That tiger was Sheroo.

রান্নাঘর থেকে সরাসরি

ফ্রায়েড মুড়িঘন্ট

উপকরণঃ

বড় রুই/কাতলা মাছের মুড়ো - ১টি
বাসমতি চাল - ২০০ গ্রাম
আলু - ১টি (বড়)
পেঁয়াজ - ১টি (মাঝারি)
তেজপাতা - ২টি
দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ - ২টি করে
গরম মশলা গুঁড়ো - ৫ গ্রাম
সর্ষের তেল - ৫০ গ্রাম
কিসমিস - ২৫ গ্রাম
আদা বাটা - ১০ গ্রাম
কাঁচা লঙ্কা - ৩/৪টি
নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো - আন্দাজমত

রন্ধন-প্রণালীঃ

একটি পাত্রে চাল ধুয়ে জল ঝড়িয়ে নিন। মাছের মুড়ো ধুয়ে নুন, হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে গরম তেলে ভালো করে ভেজে রাখুন। এরপর কুচিয়ে কাটা পেঁয়াজ, ছোট করে কাটা আলু, দারুচিনি, লবঙ্গ, এলাচ এবং তেজপাতা মুড়োর সাথে মিশিয়ে কিছু সময় ভেজে নিন। এবারে ভাজা মুড়োর সাথে চাল মিশিয়ে অল্প আঁচে ৫ মিনিট রেখে দিন। এরপরে তাতে নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং আদা বাটা দিয়ে কষতে থাকুন। ২ মিনিট পরে অল্প জল এবং লম্বালম্বি ভাবে চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে রন্ধন পাত্রটি ঢেকে দিন। জল শুকিয়ে আসার পর, কিসমিস ও গরম মশলা গুঁড়ো মিশিয়ে হাল্কা ভাবে নেড়ে দিন এবং মিনিট খানেক অল্প আঁচে ঢেকে রাখুন। তৈরি হয়ে গেল ফ্রায়েড মুড়িঘন্ট। লুচি কিংবা পরটার সাথে অথবা স্ন্যাক্স হিসেবে খেয়ে আনন্দ পাবেন।

মূল রেসিপি - শ্রীমতি দীপ্তি চক্রবর্তী
সঙ্কলন ও অনুলিখন - সুলগ্না পাত্র

মাছের মাথার ঘন্ট

বড় রুই / কাতলা মাছের মুড়ো - ১টি
বাটারনাট স্কোয়াস (ছোট) - ১টি
ছোলার ডাল - ১০০ গ্রাম
আলু - ১টি (বড়)
বেগুন - ১টি
ফুলকপি - আধা
বরবটি - ২০০ গ্রাম
গাজর - ২টি
পেঁয়াজ - ১টি (মাঝারি)
টম্যাটো - ১টি
সর্ষের তেল - ৫০ গ্রাম
আদা বাটা - ১টি টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কা - ২টি
পাঁচফোড়ন - ১ টেবিল চামচ
ধনে পাতা - সামান্য
গরম মশলা গুঁড়ো - ১ টেবিল চামচ
নুন, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো - আন্দাজমত

রন্ধন-প্রণালীঃ

একটি পাত্রে ছোলার ডাল ভিজিয়ে রাখুন ঘন্টা খানেক। অন্য একটি পাত্রে তেল গরম করে, মাছের মুড়ো ভেজে আলাদ করে রাখুন। তারপর, ঐ পাত্রে শুকনো লঙ্কা ও পাঁচ ফোড়ন দিয়ে, কুচোনো পেঁয়াজ ভাজুন। পেঁয়াজ লাল হয়ে এলে, ভেজানো ছোলার ডাল দিন। ডাল সামান্য ভাজা হয়ে এলে তাতে কেটে রাখা বাকি সব্জিগুলি ঢেলে, কষতে থাকুন। সব্জি সেদ্ধ হয়ে আসার পরে, তাতে ভাজা মাছের মুড়ো মিশিয়ে, রন্ধন পাত্রটি ঢেকে দিন এবং অল্প আঁচে রাখুন। ৫ মিনিট পরে আন্দাজমত জল দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না হতে দিন। জল শুকিয়ে আসার পর, গরম মশলা গুঁড়ো ও ধনে পাতা ছড়িয়ে, গরম গরম পরিবেশন করুন।

মূল রেসিপি - শ্রীমতি নিরুলতা পাত্র
সঙ্কলন ও অনুলিখন - সুলগ্না পাত্র

পুজোর শব্দছক

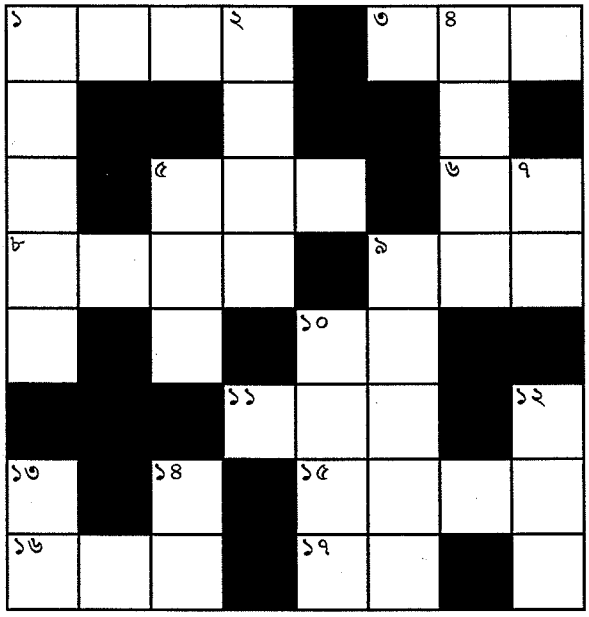

কৌশিক চক্রবর্তী

সূত্র ঃ

পাশাপাশি	উপর-নিচ
১ এখানেই দশাশ্বমেধ ঘাট	১ স্বামীজি এখানেই দুর্গা পূজার প্রচলন করেন
২ শরৎ সম্পর্কিত	২ বাউল ভাষার যে রূপে গান বাঁধে
৫ দু'পক্ষের বিবাদ, কোন্দল	৪ দুর্গার উৎপত্তি কালে কুবের দেবীকে যা দিয়েছিলেন
৬ "মধুর আমার মায়ের _____, চাঁদের মুখে ঝরে"	৫ ইনি জনৈক পৌরাণিক দেবী
৮ মা দুর্গার আরেক নাম	৭ ভেজা, আর্দ্র
৯ রক্তিম বর্ণ, লাল আভা	৯ সাধারণ মানুষ
১০ হাড়-_____ করা ঠাণ্ডা	১০ ইনি দুর্গাকে দিয়েছিলেন সিংহ বাহন
১১ আমরা যেখানে বাস করি	১২ প্রচুর, অঢেল
১৫ উচ্ছল, চটপটে	১৩ যিনি কবিতা লেখেন
১৬ এতে মিলায় বস্তু	১৪ এই গোল্লা খেতে মিষ্টি
১৭ এই মঙ্গেশকর বিখ্যাত গায়িকা	

সমাধান ৪২ নং পৃষ্ঠায়

যে সমস্ত সভ্যবৃন্দ অর্থ দান করে 'মিলনী'-কে বিশেষ সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন -

সুমিত ও দেবযানী নন্দী

পার্থ সারথী ও দীপিকা ঘোষ মৌলিক

সুমিত ও সুরূপা শূর

অনির্বান ও সুজাতা চক্রবর্তী

নটরাজন ও নিবেদিতা রায়

অভিজিৎ ও নীলাঞ্জনা দত্ত

অরিন্দম ও শাশ্বতী হালদার

শৌভিক ও তুহিনা নন্দী

হেমন্ত ও মধুমিতা মুখার্জী

কৌশিক ও সুলগ্না চক্রবর্তী

অনুরাধা ও জয়দীপ মুখার্জী

মানিক ও শিখা সরকার

দীপক ও সুহিতা সিনহা

সায়ন্তনী ও অক্ষয় মহাজন

সুদীপ্ত চক্রবর্তী ও সৌমিতা দত্ত

মনোজিৎ ও নীলাঞ্জনা সেনগুপ্ত

ঋষিরাজ, দেবারতি ও রূপকথা বিশ্বাস

শুভব্রত ও রঞ্জিতা ঘটক

সুমিত ও মল্লিকা চন্দ্র

বোধায়ন ও কাঁকন চক্রবর্তী

শুভময় গাঙ্গুলী

ইন্দ্রাক্ষী রায়

'মিলনী'-র পক্ষ থেকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সময়ের অভাবে যাদের নাম পত্রিকায় দেওয়া সম্ভব হল না
আমাদের milonee.net ওয়েবসাইটে আমরা তাঁদেরকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছি।

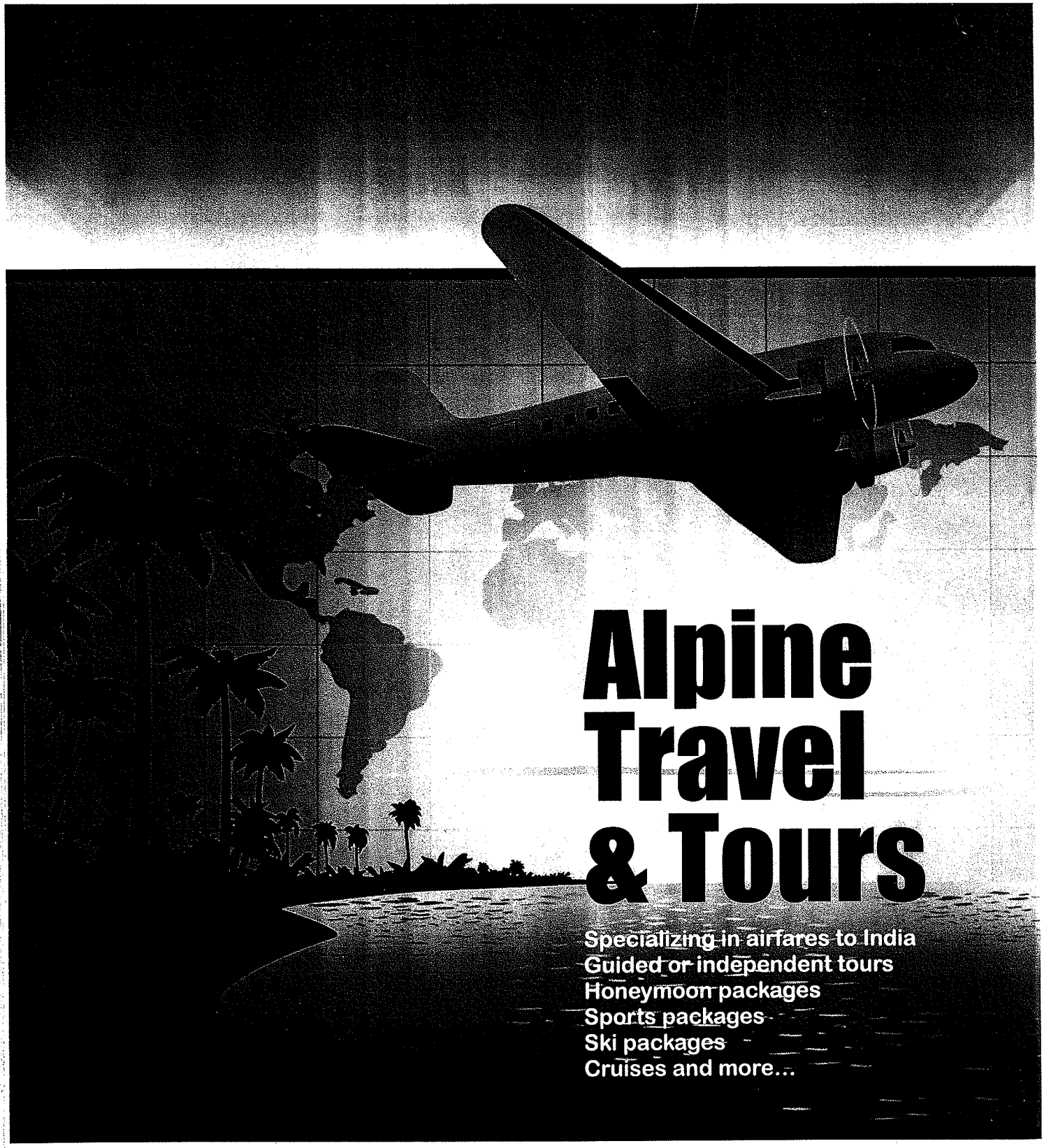

Contact

Eby Johnson

Phone: 303-200-4540, Fax: 303-200-4541
Toll free: 1-877-ALPINES, Email: eby@alpine5.com